মালা-চন্দন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সন ১৩২৯ সাল

মূল্য ১।০ সিক্কা

প্রকাশক—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী
শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়
রায় এণ্ড রায়চৌধুরী
২৪নং কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেট,
কলিকাতা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৩৫।২২

বন্ধু

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম, এ,

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি, এল,

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

আপনারা আসল আর্টিষ্ট ;—কারণ আর্টের খাতিরে নিন্দুকের ভ্রূভঙ্গিকে আমল দেন নি।

আপনারা দেশহিতৈষী ;—কারণ শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত বঙ্গ-রঙ্গালয়ের যোগস্থাপন ক'রে তাকে জাতে তোল্‌বার চেষ্টা পেয়েছেন।

আপনারা শ্রদ্ধার পাত্র ;—কারণ রসিকের সঙ্গে আনন্দের পরিচয়-সাধন ক'রে দেবার জন্যে অশেষ স্বার্থত্যাগ করেছেন।

এই ছোট বইখানি তাই আপনাদের নামেই উৎসর্গিত ক'রে ধন্য হলুম। ইতি—

কলিকাতা
২১, পাথুরিয়াঘাটা বাই লেন

গুণমুগ্ধ
হেমেন্দ্রকুমার রায়

উপহার

State Library

[illegible]

[illegible]

[illegible]



কলঙ্কী

এবার পূজোর ছুটিতে দেশে গিয়ে দেখি, গাঁয়ের শিবতলার ঘাটে লোক একেবারে গিস্‌গিস্ করছে। শুনলুম সেখানে নাকি কে-একজন সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়ে বসেছে, আর তাকে দেখে গাঁয়ের যত-সব নিষ্কর্ম্মার ভক্তির সাগর একেবারে উথলে উঠেছে।

সাধু সন্ন্যাসীর জন্যে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। হাতের ঐ ত্রিশূল দুইয়ে সহরের ভিতরে তারা প্রণামী আদায় করে; আবার ঐ ত্রিশূলই উঁচিয়ে এবং খুঁচিয়ে সহরের বাইরে তারা নির্জ্জন পথের একলা-পথিকের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়। তাদের ঐ ছাইমাথা দেহ আর গেরুয়া-রঙের কাপড়, ও-সব হচ্ছে পুলিস ভোলাবার ছদ্মবেশ! গুণ্ডা-বদমায়েসকে দেখলেই চেনা যায়, তাই তাদের আমি ততটা ভয় করি না—যতটা ভয় করি এই ছদ্মবেশী সাধু-সন্ন্যাসীদের। ...... কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর নামে কী মোহ আছে জানি না, তাই এ-দেশের সুধু মূর্খ বলে নয়,—পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত সন্ন্যাসের এই জীবন্ত 'ক্যারিকেচার'গুলির পদতলে মাথা বিকিয়ে দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব!

আমার এক শিক্ষিত বন্ধু আছেন, তিনি তাঁর সন্ন্যাসী-গুরুকে ভক্তি করেন দেবতার মত। গুরুকে এতটা ভক্তি করার কারণ

জান্‌তে চাইলে তিনি সম্ভ্রমে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লেন, "তুমি জান না হে, আমাদের গুরু হচ্ছেন অসাধারণ লোক! তিনি একাসনে বসে পাঁচবোতল মদ, দশ-ছিলিম গাঁজা, একটা আস্ত পাঁটা খেয়ে হাস্‌তে-হাস্‌তে হজম করে' ফেল্‌তে পারেন!" আমি বল্লুম, "এইজন্যে তুমি তাঁকে ভক্তি কর?" তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ।"......

বিকালবেলায় কি করব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম, যাই, একবার ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে শিবতলার ঘাটের সন্ন্যাসীটিকে দেখে আসি। সারাদিন লোকমুখে সন্ন্যাসীর যে-রকম গুণগান শুন্‌ছি, তাতে-করে' লোকটার মিথ্যা ভড়ং আর বাজে বুজ্‌রুকি ভেস্তে দেবার জন্যেও মনের মধ্য থেকে একটা দুর্দ্দম ইচ্ছা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠ্‌ছিল!

শিবতলার ঘাটে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য। সেই জনতার মধ্যে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। বাঙ্‌লাদেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা আর মাসিকপত্রের সম্পাদকরা নারীজাতির কাছে একবিষয়ে সমান-ঋণী;—অন্তঃপুরের নির্ব্বিচার উদারতার গুণেই আজ-পর্য্যন্ত এঁরা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে-বর্ত্তে আছেন!

চারপাশের পাঁচ-সাতখানা গ্রাম থেকে আজ এখানে লোক এসে জুটেছে—সেই শশব্যস্ত জনতার মধ্যে সন্ন্যাসী-ঠাকুরের ভস্মাবৃত দেহ ও লট্‌পটে জটাজুট যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, প্রথমে তা কিছুতেই আবিষ্কার করতে পার্‌লুম না।.........

অবশেষে যখন ভস্মাবৃত দেহ ও দীর্ঘ জটাজুট,—সন্ন্যাসী-ক্লাবের এই অপরিহার্য্য ইউনিফর্ম্‌ দেখ্‌বার আশায় জলাঞ্জলি দান কর্‌লুম, তখন হঠাৎ দেখা গেল, বটতলার বাঁধানো রোয়াকের উপরে যে

লোকটির পায়ের তলায় এতগুলো লোক মাথা খুঁড়ে কপাল ফুলিয়ে মরছে, তার মাথায় জটাজুটের বহর বা গায়ে কাঠকয়লার ছাই—এ-সব কোন জ্বালা-জঞ্জাল নেই! পাশেই ত্রিশূল আর ভিক্ষার ঝুলি আছে কিনা দেখবার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লুম—কী আশ্চর্য্য, সেখানে সুধু একটা দামী চামড়ার পেটমোটা ব্যাগ পড়ে হাঁসফাস্ করছে!

ভেক্ নেই, ভিক্ষে মিলছে! কিন্তু একটু ভাবতেই এই সন্ন্যাসীটির ব্যবসাবুদ্ধি যে কতটা ধারালো, তা পরিষ্কার বোঝা গেল। ভস্মাবৃত দেহ ও দীর্ঘ জটাজুট প্রভৃতির কাছে ক্রমাগত ঠকে-ঠকে লোকের ভক্তি ক্রমেই শ্রান্ত ও 'অবিশ্বাসী' হয়ে পড়েছে—অতএব এখন ভেল্ না-ফেরালে সন্ন্যাসের ব্যবসা আর ভালোরকম চলা শক্ত!

ইতিমধ্যে 'আতাই-কোলা'র ছোটতরফ এসে সন্ন্যাসীর সামনে দণ্ডবৎ হয়ে, ঝনাৎ করে' এক গিনি প্রণামী ছাড়লেন। সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ স্বরে প্রতি-নমস্কার করে' বল্লেন, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন!"......হুঁ, ঠাকুরটির ভদ্রতা আর ব্যবসা-বুদ্ধি দুইই দিব্যি টনটনে দেখছি! ইনি চালাকের মত প্রণাম ফিরিয়ে দেন, কিন্তু বোকার মত প্রণামী ফিরিয়ে দেন না!

একটু তফাতে বসে-বসে মজা দেখতে লাগলুম। কত লোক এল, কত লোক গেল। সন্ন্যাসী কারুকে ওষুধ দিলেন, কারুকে দুটো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেই বিদায় করলেন। অনেকে হাত দেখাতে এল, কিন্তু সন্ন্যাসী বল্লেন, ও-সব গোণা-টোনা তাঁর আসে না। কেউ-কেউ বন্ধ্যা নারীর ছেলে হবার জন্যে ধর্ণা দিয়ে পড়ল,

সন্ন্যাসী এই বলে তাদের মুখবন্ধ করে' দিলেন যে, খোদার উপরে খোদ্‌কারী করা তাঁর ব্যবসা নয়!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠ্‌ল। বটতলা থেকে ভক্তের দল ক্রমেই কম্‌তে লাগ্‌ল। আমি কিন্তু তখনো উঠ্‌লুম না—এই সন্ন্যাসীটি কি দরের লোক তা না জেনে আমার যেতে ইচ্ছা কর্‌ছিল না।

বটতলা যখন প্রায় জনশূন্য, সন্ন্যাসীর চোখ তখন আমার উপরে পড়্‌ল। খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে, সন্ন্যাসী হঠাৎ হেসে উঠে বল্লেন, "আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করেন না, তখন এখানে বসে মিছে সময় নষ্ট কর্‌ছেন কেন?"

আমি একেবারে হতভম্ব!

সন্ন্যাসী আবার হেসে বল্লেন, "আপনি পূজোর ছুটিতে সবে আজ কল্‌কাতা থেকে এখানে এসেছেন, এসেই আমাকে অবিশ্বাস কর্‌তে সুরু করেছেন? ছিঃ, মানুষ হয়ে মানুষকে এত সহজেই কি অবিশ্বাস করতে আছে ফণীবাবু?"

তাই ত, অবাক কর্‌লে যে! আমি এঁকে অবিশ্বাস করি, আমি কল্‌কাতায় থাকি, পূজোর ছুটিতে আজই দেশে ফিরেছি, আমার নাম ফণী, সন্ন্যাসী যে সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্ বল্‌ছেন! যে দু-চারজন দর্শক তখনো সেখানে বসে ছিল, বিষম বিস্ময়ে তাদের চোখ যেন কোটরের ভিতর থেকে ঠিক্‌রে পড়্‌বার মত হয়ে উঠ্‌ল।

তবে কি এ সন্ন্যাসী খাঁটি লোক—সত্যিই কি এঁর দৈবশক্তি আছে?… … …হঠাৎ সন্ন্যাসীর সাম্‌নের থালায় একরাশ টাকার দিকে আমার নজর পড়্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা ফের রুখে আর বেঁকে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী খরচোখে আমার হাবভাব নিরীক্ষণ কর্‌ছিলেন। যেন আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেই তেম্‌নি হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, "ফণীবাবু, আপনি ভাব্‌ছেন যে, লোকের কাছে প্রণামী আদায় করে' যে-লোকের দিন চলে, সে নিশ্চয়ই ভণ্ড, চোর, জোচ্চোর! কেমন, আমি ঠিক বলেছি কি না?"

সন্ন্যাসী কি অন্তর্যামী? লজ্জায় আমি মাথা হেঁট কর্‌লুম।

—"ফণীবাবু, যান, বাড়ী গিয়ে আপনার ফাউন্‌টেন পেন দিয়ে, আপনি যে-সবুজ কালিতে লেখেন, সেই কালিতে পকেটবুকে বড়-বড় করে' লিখে রাখুন-গে যে, মানুষকে ভালো করে' না-চিনে অবিশ্বাস করা মহাপাপ।"

আমি ফাউন্‌টেন পেনে সবুজ কালিতে লিখি, এটাও সত্য!

সন্ন্যাসী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, "ফণীবাবু, এ টাকা আমি নিজের পেট-ভরাবার জন্যে নিচ্চি না—এ টাকায় আমি দরিদ্র-নারায়ণের পূজা কর্‌ব।... ... সন্ধ্যা হোলো, এখন বাড়ী যান। কাল বৈকালে আবার যদি আসেন ত, আমি খুসি হব। এখানে কাঙালী-ভোজন হবে, আপনি তাতে আমার সাহায্য কর্‌বেন।"

আমি সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে একখানি পাঁচ টাকার নোট রেখে অনুতপ্ত স্বরে বল্লুম, "আপনার দরিদ্র-নারায়ণের পূজায় আমার এই সামান্য অংশ গ্রহণ করুন।"

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মুখে বল্‌লেন, "আপনার মঙ্গল হোক্‌।"

... ...

খুব ঘটা করে' কাঙালী-ভোজন হয়ে গেল। সুধু পেট-ভরে

খাওয়া নয়—সেই সঙ্গে প্রত্যেক কাঙালী এক-খানি করে' নতুন কাপড় আর চাদরও পেয়ে, হাসিমুখে সন্ন্যাসীর নামে জয়ধ্বনি কর্‌তে-কর্‌তে বিদায় হ'ল।

কাঙালী ও দর্শকের দল যখন একে-একে চলে গেল, সন্ন্যাসী তখন আস্তে-আস্তে ঘাটের কিনারায় গিয়ে নদীমুখো হয়ে বসে পড়্‌লেন।

পূর্ণিমার রাত্রি,—তরল জ্যোৎস্নার চিকণ রৌপ্য-রঙে তুলি ডুবিয়ে, চাঁদ তখন কালো মেঘের ধারে-ধারে ঝল্‌মলে আলোর পাড় এঁকে দিচ্ছিল।

সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে' শেষটা তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম;—এই সন্ন্যাসীটির মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত তলিয়ে দেখ্‌বো,—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছে!

গায়ের উপরে আমার ছায়া পড়্‌তেই সন্ন্যাসী চম্‌কে উঠে মুখ তুল্‌লেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "আপনি এখনো যান-নি!"

—"না, আপনার কাছ থেকে যেতে ইচ্ছে কর্‌চে না।"

—"তাহলে বসুন।"

সন্ন্যাসীর পাশে ঘাটের পৈঠার উপরে বসে পড়্‌লুম।

একটু চুপ করে' থেকে সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "আপনার দেখ্‌চি আমার উপরে খুব বিশ্বাস হয়েচে! যারা যত সহজে অবিশ্বাস করে তারা তত সহজে বিশ্বাসও করে!"

আমি মৃদুস্বরে বল্‌লুম, "আপনার অলৌকিক শক্তি দেখেও আপনাকে যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে—"

বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "অলৌকিক শক্তি দেখে সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস! তাহলে যাদুকরের মত মহাযোগী আর কে আছে ফণীবাবু?"

—"কিন্তু যাদুকররা যে ভেল্কী দেখায়, সেটা যে একটা লোক-ঠকানো ব্যাপার।"

—"আমিও অলৌকিক কিছু দেখাই-নি, যা দেখিয়েছি তা আপনাকে ঠকাবার জন্যেই দেখিয়েচি। একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাক্‌লে আপনিও আমার মত শক্তি দেখাতে পার্‌তেন!"

—"কিন্তু আপনি আমাকে দেখে যে-সব কথা বলেছেন, তা কি যে-সে লোক বল্‌তে পার্‌ত?"

—"সবাই পার্‌ত! আপনার চোখ-মুখের ভাব দেখে আমি বুঝেছিলুম, আপনি আমাকে সন্দেহ কর্‌চেন।...আপনার বাঁ-হাতে উল্কীতে নামের তিনটি আদ্য অক্ষর আছে, এফ, এন, জি। এফ আর এন-এ সাধারণত ফণীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য নাম হয় না, সুতরাং আপনার নাম আন্দাজ করাও কিছু শক্ত নয়।...এই ছোট গ্রামটিতে আমি এসেছি আজ কুড়ি-পঁচিশ দিন। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবাই আমাকে দেখ্‌তে এসেছে—সবাইকে আমি চিনি। কিন্তু আপনাকে আমি কাল বিকালে প্রথম দেখ্‌লুম, তা-থেকে বুঝ্‌লুম আপনি নতুন আগন্তুক।...এখন পূজোর ছুটি পড়েচে, অতএব পূজোর ছুটিতেই আপনি এসেছেন; আপনার পায়ের চটিজুতো, মাথার চুল-ছাঁটা, গায়ের পাঞ্জাবী—সব কলকাতার হাল-ফ্যাসানের বাবুর মত কাজেই ধরে নিলুম আপনি আস্‌ছেন কলকাতা থেকে।...আপনার পাঞ্জাবীর বুক-পকেটের

এককোণে দেখ্‌লুম, সবুজ কালির অস্পষ্ট দাগ। বুক-পকেটের ও-রকম জায়গায় ও রকম কালির দাগ সহজে লাগে না—আপনি যদি ওখানে ফাউন্‌টেন পেন গুঁজে না-রাখেন।... ... ফণীবাবু, আপনি কত সহজে ঠকে গেছেন, দেখ্‌ছেন ত? সন্ন্যাসীর কাছে অলৌকিক ব্যাপারের প্রত্যাশা কর্‌লে এম্‌নিভাবেই ঠক্‌তে হয়! আমরা :সন্ন্যাসীরা মানুষ মাত্র;—মানুষের মতই আমাদের দেখ্‌বেন।”

সন্ন্যাসী মুখ ফিরিয়ে নদীর ওপারের দিকে তাকালেন। সেখানে গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় দেদার আলোর ফুলঝুরি ঝরে পড়ছিল—আজ জ্যোৎস্নার দেওয়ালি-উৎসব ভরপুর জমে উঠেছে! ... সন্ন্যাসীর কথা শুনে, আমিও বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী আবার ধীরে ধীরে বল্লেন, “আমার ওপরে আপনার বোধ হয় আর-একটুও শ্রদ্ধা নেই?”

—“আপনি এমন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?”

—“কারণ, আপনি এখন বুঝেছেন যে, আমি কোন অলৌকিক কাজ কর্‌তে পারি না!”

—“হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি যে আমি আপনাকে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ ভেবেছিলুম। কিন্তু আপনি নিজেই যখন আমার সে ভ্রম ভেঙে দিলেন, তখন এটা বুঝ্‌তে পারছি, আপনিই যথার্থ সাধু—লোক-ঠকাতে সন্ন্যাস-ব্রত নেন-নি!”

সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টিতে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে, অন্যমনস্কভাবে খুব মৃদু স্বরে বল্লেন, “না, লোক-ঠকাতে সন্ন্যাস-ব্রত নিইনি—আমি সন্ন্যাসী হয়েছি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে!”

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা অবরুদ্ধ হাহাকারের প্রতিধ্বনি ছিল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

সন্ন্যাসী যেন অর্দ্ধস্বগত ভাবে আবার বল্লেন, "কিন্তু আজও বুঝ্‌তে পারি না, আমি যা করেছি তা ন্যায় কি অন্যায়......... আমার অবস্থায় পড়্‌লে অন্য লোক কী কর্‌ত?......আমি তা জান্‌তে চাই!"—সন্ন্যাসী ঘাড় হেঁট করে' কি-যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বেশ বুঝ্‌লুম, তাঁর মন এখন বর্ত্তমান থেকে একেবারে অতীতে ফিরে গেছে!

আচম্‌কা মাথা তুলে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আপনি বল্‌তে পারেন?"

এই অসংলগ্ন প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে আমি বল্লুম, "আপনি কি বল্‌ছেন!"

—"আমি যা করেছি তা ন্যায় কি অন্যায়?"

—"কিন্তু আপনি কি করেছেন?"

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে মুখ ফিরিয়ে, শান্ত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন, "ও, আপনি আমার কথা কিছুই জানেন না—না? আচ্ছা, আজ তবে আপনাকে আমার কথা বল্‌ব,—দেখি, এই দুঃখ-স্মৃতির কথা প্রকাশ করে' দিয়ে প্রাণে একটু শান্তি পাওয়া যায় কিনা!"

—এই বলেই সন্ন্যাসী হঠাৎ তাঁর কথা সুরু করে' দিলেন—তিনি কে, কাদের কথা বল্‌ছেন [illegible] দিয়েও গেলেন না!

... ...

"কনকলতাকে সুধু আমি ভালোবাস্‌তুম না, তাকে আমি পূজা করতুম দেবীর মত। এই কথাটি আপনাকে মনে রাখ্‌তেই হবে ………সুধু ভালোবাস্‌লে তার জন্যে আমি যা করেছি, হয়ত আমার দ্বারা তা সম্ভব হোতো না; কিন্তু সম্ভব যে হয়েছে তার আসল কারণ, আমি তাকে পূজা কর্‌তুম, পূজা!

তার প্রতি আমার এই অন্ধ ভক্তির কথা, সে জান্‌ত। কিন্তু আমাকে সে কি চোখে দেখ্‌ত, আমি আগে তা জান্‌তে পারি-নি।……খালি এইটুকু বুঝ্‌তে পার্‌তুম, আমাকে সে ঘৃণা কর্‌ত না!

লেখাপড়ার দিকে তার কি টান্‌ ছিল! তাকে পড়াতে বসে, কথাপ্রসঙ্গে আমি যখন তার কাছে পৃথিবীর নানা দেশের কথা, নানা জাতির কথা, নানা সাহিত্যের কথা সরল ভাষায় বলে যেতুম, সে তখন কী আগ্রহভরে তার ডাগর চোখদুটি তুলে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌ত! তার সে দৃষ্টি আমি এখনো ভুলি-নি!

দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল আমি তাকে পড়িয়েছিলুম! ছয়বৎসর আমার সাম্‌নে সে রোজই এসে দাঁড়িয়েছে… সেই ছয় বৎসরের দিকে আজও আমার সমগ্র জীবন একাগ্র হয়ে আছে! আমার চোখের সুমুখেই তার কিশোরী তনু-লতায় যৌবনের প্রথম ফুল ফুটে উঠেছিল; কৈশোর ও যৌবনের মিলন-ক্ষণে তার চোখে-মুখে রূপ-মহিমার যে অপূর্ব্ব শিখা জ্বল্‌তে দেখেছি, আজ-পর্য্যন্ত আর-কোথাও তার তুলনা পাই-নি।

তখন এক দীর্ঘ স্বপ্নের মধ্যে বাস কর্‌তুম। যখন যেখানে, যে কাজে থাক্‌তুম, কনকলতার স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে

রাখ্‌ত। পৃথিবীর এত দৃশ্য, এত শোভা, এত লোকজন, আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ, এ-সবই যেন মনে হ'ত তুচ্ছ, অকারণ, খাপছাড়া—স্রষ্টার সৃষ্টি যেন সার্থক হয়েছে একমাত্র ঐ কনকলতার জন্যেই! •

.....আপনি বোধহয় বুঝ্‌ছেন, যার অবস্থা এমন,—সে কখনো মনের ভাব লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। তখনো পর্য্যন্ত মুখ ফুটে যদিও আমি কনকলতার কাছে মনের একটি কথাও খুলে বলি-নি, কিন্তু তবু হয়ত আমার মুখে-চোখে, ভাবে-ভঙ্গিতে আমার গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। কনকলতা বোধহয় বুঝ্‌তে পেরেছিল যে, তার প্রতি আমার যে ভাব, সেটা, ছাত্রীর প্রতি ঠিক শিক্ষকের ভাবের মত নয়! কারণ, পড়্‌তে-পড়্‌তে হঠাৎ মাথা তুলে ইদানীং যখনি সে দেখ্‌ত, টেবিলের এককোণে বসে আমি নির্ণিমেষ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছি, তখনি সে আবার ঘাড় হেঁট করে' ফেল্‌ত, আর তার সারা মুখখানি—কোঁকড়া-চুলে-ভরা ছোট্ট কপালখানি থেকে সুডৌল চিবুকের তলাটি পর্য্যন্ত,—একেবারে লালে লাল হয়ে উঠ্‌ত! এমন-কি, তার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হ'লে, অনেক সময় সে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়েও আর বল্‌তে পার্‌ত না!......কনকলতার সঙ্গে আমার ত আর নূতন পরিচয় নয়, এর আগে সে আমাকে কতবার দেখেছে, আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে, প্রাণ খুলে কত কথাই না কয়েছে! এতদিন পরে আজ তবে তার এমন ভাব কেন? এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ কেন?...... হ্যাঁ, নিশ্চয় সে আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছে! এ-বিষয়ে আর কোন

সন্দেহই নেই,—কারণ, এদিকে রমণীর অনুভূতি পুরুষের চেয়ে ঢের-বেশী সচেতন।

এখানে আমি অনেকটা সান্ত্বনা পেতুম। আমাকে সে কি ভাবে দেখে, তা জান্‌তুম না—খালি এইটুকু দেখ্‌তে পেতুম, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যখনি তার ঘরটিতে গিয়ে ঢুক্‌তুম তখনি তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত! আমি গেলে সে যে খুসি হয়, এই-টুকুই আমার যথা-লাভ!

এর বেশী আর-কিছুর আশাও আমার ছিলনা। আমি আর সে যত-কাছাকাছিই থাকি না কেন, আমাদের মাঝখানে এক অসম্ভবের পাঁচিল দাঁড়িয়ে, তাকে আর আমাকে আজীবন আলাদা করে' রাখ্‌বেই রাখ্‌বে! কনকলতার সঙ্গে আমার বিবাহ যে অসম্ভব, তা আমি জান্‌তুম। সমাজের পাহারা এখানে বড় কড়া—কারণ, আমি হচ্ছি ব্রাহ্মণ আর সে ছিল কায়স্থ।

……এইভাবে দিন যাচ্ছিল। কনকলতা কখনো আমার হবে না, এ-কথা জেনেও, অন্তত এই ভেবেও আমি সুখী ছিলুম যে, তাকে ত আমি রোজ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তার মধুর বাণী, তার কোমল স্পর্শ থেকে ত আমি বঞ্চিত নই! কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র সুখের মেঘেও আচম্বিতে আগুন লাগ্‌বার উপক্রম হ'ল!

কনকলতার বাপ-মায়ের অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে, তাঁদের মেয়ের বয়স অত্যন্ত বেশী হয়ে গেছে—এইবার তার আইবুড়ো নাম ঘোচানো দরকার। অতএব অবিলম্বে পাত্র-সন্ধানের ঘটা লেগে গেল।

নদীর ভাঙন-ধরা কূলের মত আমার মনের একদিকটা যেন

ধ্বসে পড়্‌ল। বুঝ্‌লুম, বিবাহ হ'লে কনকলতাকে আর কখনো চোখেও দেখ্‌তে পাব না! অথচ এ বিবাহে বাধা দি, এমন শক্তিও আমার নেই! কিন্তু, তবু—তবু—

দুর্ভাবনায় দু-রাত্রি আমি ঠায় জেগে-জেগে কাটিয়ে দিলুম।

হঠাৎ মোহিতকে মনে পড়্‌ল। এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত তাতে-আমাতে একসঙ্গে পড়েছিলুম। এখনো তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় —তবে কালে-ভদ্রে, পথে-ঘাটে! মোহিত গৃহস্থের ছেলে, এম এ বি-এল পাশ দিয়ে আজকাল পুলিস-কোর্টে ওকালতি কর্‌ছে। দেখ্‌তেও ভালো, জাতেও কায়স্থ। আর, এখনো অবিবাহিত।

মোহিতের সঙ্গে কনকলতার বিবাহ দেবার জন্যে কোমর বেঁধে আমি ঘটকালি সুরু কর্‌লুম। পাত্রের গুণবর্ণনা শুনে কনকলতার বাপ খুসি হয়ে এককথার উপরে আর দু-কথা বল্‌লেন না! মোহিত প্রথমটা বিবাহে নারাজ হয়েছিল; কিন্তু বরপণের পরিমাণ শুনেই তার উকিলী বুদ্ধি নিম-রাজি হয়ে পড়্‌ল এবং স্বচক্ষে যেদিন সে মেয়েকে দেখ্‌লে, সেইদিনই একসঙ্গে মোহিতের চক্ষু, মত্‌ আর বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল!

আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হলুম। ঠিক কর্‌লুম, মোহিতের এখন দিনকতক খুব মেলা-মেশা করে' আমাদের আগেকার বন্ধুত্বে পরিণত কর্‌তে হবে। তাহ'লে বিবাহের পরেও আর আমার চোখের আড়াল হবে না! এই ক্ষুদ্র স্বার্থ মোহিতের সঙ্গে কনকলতার বিবাহ-ব্যাপারে আমি অন্য কোথাও বিবাহ হ'লে কনকলতাকে আমি পেতুম না!

আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে, আমি কী ভ্রম করেছিলুম! কনকলতাকে চোখে দেখ্‌তে পাব—এই সামান্য দুর্ব্বলতায় আমি তখন একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, তখন জান্‌তুম না যে, সেই দুর্ব্বলতার শাস্তি আমাকে চিরজীবন ধরে ভোগ কর্‌তে হবে।

কিন্তু এক ভ্রমের উপরে আমি আবার আর এক ভ্রম করে' বস্‌লুম। এই দ্বিতীয় ভ্রমের যে শোচনীয় ফল হয়েছিল, জন্ম-জন্মান্তরেও আমি কি তা ভুল্‌ব?

......অনেক চেষ্টা করে'ও, কনকলতার বিবাহের আগের দিনে আমি আর কিছুতেই আপনাকে সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। কখনো যা করি-নি, সেদিন আমি মনের ঝোঁকে তাই করে' ফেল্‌লুম। জানি না, সেদিন আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম কিনা!

বিবাহের আগের দিনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। ...নকলতার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব জেনেও, তাকে ছাত্রীরূপে ...ে এতদিন আমি তবু কতকটা পরিতৃপ্ত ছিলুম; কিন্তু এ তুলভ ...ার থেকে এখন আমি বঞ্চিত হ'তে চলেছি, এই দুশ্চিন্তা ...খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্রমেই কাতর করে' তুল্‌লে।

...াবেগে সেদিন কনকলতাকে এক চিঠি লিখে ফেল্‌লুম—

তুমি আর আমার ছাত্রী নও—আমার কাছ থেকে ...কেড়ে নেবে। তোমার অভাব আমি জীবনে ...ব না। এতদিনের পরিচয় একদিনে ভোলা

যায় না,—আর, আমি ভুল্‌তেও চাই না! কারণ, তোমাকে ভুল্‌লে আমি আর কি নিয়ে বেঁচে থাক্‌ব,—আমার অন্ধকার জীবন-পথে তোমার স্মৃতিই যে এখন পূর্ণিমার চন্দ্রালোক!

কনক, তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু আমার এ প্রেম তোমার রূপযৌবনকে প্রার্থনা করে না—এ চায় সুধু তোমার স্মৃতিকে পূজা করতে। এইটুকু বুঝে আমার এই অভাগা প্রেমকে তুমি মার্জ্জনা কোরো।

তোমার বিবাহিত জীবন সুন্দর হোক্, সফল হোক্, সুখের হোক্, এই আমার শেষ-কামনা।”

চিঠি পড়ে কনকলতার মনের ভাব কি-রকম হয়েছিল, তা আমি জানি না।

কিন্তু এখন ভাবি, উপন্যাসের হতাশ ও নির্ব্বোধ প্রেমিকের মত এই হা-হুতাশে ভরা পত্রখানা, তখন আমি লিখেছিলুম কোন্ উদ্দেশ্যে? আসন্ন বিবাহ-লগ্নে আমি কি তাকে প্রকারান্তরে এই কথাই বল্‌তে চেয়েছিলুম যে, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে ভুলো না—স্বামীর সংসারে গিয়েও তুমি আমার প্রে- মনে রেখ’?

......আমার অবস্থায় পড়্‌লে মানুষের মনে এম্‌নি চিত স্বাভাবিক বটে! আজ এতদিন পরে, যদিও ঠিক করে' পারি না, তবু মনে হয়, আমার পত্র-লেখার উদ্দেশ্য আমি বোধ হয়, আর-কিছু না ভেবে-চিন্তেই, ক আমার মনের অবস্থাটা জানাতে চেয়েছিলুম। প্রতি কনকলতার মনের ভাব কি-রকম, আমি

সুতরাং, বিবাহের পরেও সে যে আমাকে মনে রাখ্‌বে, এমন ভাববার কোন সঙ্গত কারণ আমার ছিল না।

ভক্ত সুধু আপন মনে দেবীকে পূজা করে'ই তুষ্ট থাক্‌তে পারে না। তার পূজা গোপন হ'লেও দেবীর কাছে যে তা গোপন নেই, অন্ততঃ এটা জান্‌তে পার্‌লেও ভক্তের প্রাণে একটা শান্তি ও সান্ত্বনার সঞ্চার হয়। এই জন্যেই, পূজা নিন আর নাই নিন, ভক্ত তার পূজার কথা দেবীকে নিবেদন কর্‌তে চায়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের কথা এখন থাক্। আমার তখনকার মনের ভাব যাই হোক্, কনকলতাকে আমি যে পত্র লিখেছিলুম, এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে সত্য আর বড় কথা। এবং এই পত্র লেখা যে আমার পক্ষে অতিশয় গর্হিত কার্য্য হয়েছিল, তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই। এর স্বপক্ষে আমার বল্‌বার কিছু নেই সুধু এইটুকু ছাড়া—যৌবন হচ্ছে অদূরদর্শী এবং প্রেম হচ্ছে অন্ধ!

তারপর দু-বৎসর কেটে গেল। মোহিতের সঙ্গে এর-মধ্যে ...র মাখামাখি এতটা ঘনিয়ে উঠেছিল যে, তার বাড়ীতে ...কাছে আর সদর-অন্দরের ভেদ ছিল না।

স্কুল থেকে মোহিতের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার ...স্বভাব যে এতখানি বদ্‌লে গেছে, তা আমি জান্‌তুম ...মোহিত ছিল ঠিক ভ্যাড়ার মত শান্ত, আর ...ভীরু। পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলে, আমরা—সহরেরা ...দ্‌আনাও কর্‌তুম যৎপরোনাস্তি। সে মুরুব্বি-...ক সময়ে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠ্‌লেও, সে ঘাড়

হেঁট করে' মুখটি বুঁজে সব সয়ে থাক্‌ত। পরে দেখে-শিখে ক্রমে অনেকটা চালাক-চতুর হ'লেও, আমাদের সঙ্গে সে কোন দিনই সমান-সমান চল্‌তে সাহস করে-নি,—গুরুর যতটা প্রাপ্য তার কাছ থেকে আমরা সম্ভ্রম পেতুম ঠিক ততখানি! তারপর সে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুক্‌ল; আমরাও দল-ছাড়া হয়ে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লুম, তা কেউ জানি না।

কলেজে ঢুকে মোহিত যখন দেখ্‌লে সেখানে সব চেহারাই তার অচেনা, তখন নিজের মুখ থেকে দীনতার মুখোস খুলে ফেল্‌তে একটুও দেরি করলে না। সে যে পাড়াগেঁয়ে ছেলে, চাল্‌চলনে কথায়-বার্ত্তায় কারুকেই তা জান্‌তে দিলে না।

পাড়াগেঁয়ে ছেলের পক্ষে সহরে আসা, মস্ত এক অগ্নি-পরীক্ষা। সহুরে ছেলেরা তাদের পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে ঠাট্টা করে এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না—তাদের পরস্পরের ভিতরে অনেকটা বিজয়-বিজিতের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। ফলে লাঞ্ছিত পল্লীবালকরা আপনাদের 'পাড়াগেঁয়ে' নাম ঘোচাবার জন্যে সহুরেদের অনুকরণ কর্‌তে শেখে। কিন্তু অনুকরণ কর্‌[illegible] গিয়ে অনেক সময়েই তারা আসলকে উঁচিয়ে যায়; এমন যেখানে সহুরে ছেলেরাও ভয় পায়, সেখানেও ভরসা [illegible] তারা প্রতিপন্ন করে, তারা পাড়াগেঁয়ে ভূত নয়। [illegible] পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা প্রায়ই যে চরিত্র হারিয়ে [illegible] আসল কারণ এই।

মোহিতেরও সেই দশা হ'ল। কলেজে ঢু[illegible] একটু-একটু করে' মদ খেতে শিখ্‌লে। [illegible]

হ'লেও অন্যদিকে তার পতনের পথ তৈরি হ'তে লাগ্‌ল।... ... তারপর সে পুলিশ-কোর্টে ঢুক্‌ল। সকলেই জানেন, যাদের চরিত্রের তেমন জোর নেই, পুলিশ-কোর্ট তাদের পক্ষে চুলোয় যাবার পথে মস্ত-এক আস্তানা। এই পুলিস-কোর্টে এসে মোহিত প্রথমে এক অভিনেত্রীকে মক্কেলরূপে লাভ করে।... ... ...তার পরের কথা না বল্‌লেও চলে।... ...মোহিতের জীবনে এখন প্রধান উপভোগ্য হচ্ছে, সুরা আর নারী।

সেই পাড়াগেঁয়ে মোহিত যে এখন এতটা সহুরে আর লায়েক হয়ে উঠেছে, এ খবর আমি ক্রমে-ক্রমে, নানান লোকের মুখ থেকে শুনে জান্‌তে পেরেছি।... ...মোহিত নিজে আমার সঙ্গে খোলাখুলি মিশ্‌লেও, তার চরিত্রের কালো দিক্‌টা আমার কাছ থেকে চেপে রেখেছিল। কেন? বোধ-হয় সে এখনো আমাকে মনে-মনে ভয় বা মান্য করে! এটা খুবই স্বাভাবিক। এক সময়ে কেউ যদি কারুর কাছে গোলামী করে' থাকে, তা'হলে পরে সে স্বাধীন ও ধনী হ'লেও পূর্ব্ব-প্রভুর সাম্‌নে ...লে, মাথাটা অন্তত একটু নীচু না-করে' থাক্‌তে পারে না। ..মোহিতেরও হয়ত তাই হয়েছে। স্কুলের সেই বাল্য-...র কথা সে আজও ভোলে-নি। তাই সে এখনো নিজেকে ...সমকক্ষ বলে ভাব্‌তে সাহসী নয়।

...মোহিতের চরিত্রের কথা যখন জান্‌তে পার্‌লুম, তখন ... একটু ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। জগতে আমার সব-...তম, তাকে আমিই মোহিতের হাতে সমর্পণ ...চোখে-চোখে থাক্‌বে বলে। কলকাতার

সঙ্গে মোহিত কেমন ব্যবহার করে ? তার হাতে পড়ে' সে কি অসুখী হয়েছে ?

চেষ্টা করেও জানতে পারলুম না। কনকলতার মুখ দেখে কিছুই ধরবার-ছোঁবার যো নেই। মুখে দুঃখ-যাতনার কোন চিহ্ন থাকা ত দূরের কথা—তাকে যখনি দেখি, মনে হয়, তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন হাসির উৎস উথলে উঠছে। তার হাসি-খুসি এখন আগেকার চেয়ে ঢের-বেশী বেড়েছে—এমন-কি, অসম্ভব-রকম। কিন্তু এইটেই আমি অস্বাভাবিক মনে করি! কনকলতা আগে ত অমন কারণে-অকারণে, যখন-তখন অত হাসি হাসত না! স্বভাবতই তার স্বভাব ছিল ধীর, স্থির, গম্ভীর। তার ঐ স্থিরতাই আমার বেশী ভালো লাগত। বয়স যত বাড়তে থাকে, মানুষের ধীরতাও তত বেড়ে উঠবারই কথা। কিন্তু তা না হয়ে কনকলতার এমন উল্টো ধরণ কেন ? তার সে ধীরতা, সে গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল ? আগে যে মাঝে-মাঝে অল্প অল্প মৃদু-হাসি হাসত, এখন সে এত উচ্চ স্বরে এত-বেশী হাসে কেন ?......এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর আমি খুঁজে পেলুম না। আমার মনটা ভারি দমে গেল।

—মানুষের হাসিকে আমি বিশ্বাস করি না! জানি, সংসারের অনেক অবরুদ্ধ অশ্রু, অনেক গোপন হাহাকার, অনেক নীরব ক্রন্দন, ঐ-এক হাসির আড়ালেই ছাইচাপা আগুনের মত ঢাকা থাকে! এ হচ্ছে গর্ব্বিত মানবের স্বভাব। পৃথিবীকে সে আপনার দুর্ব্বলতা দেখায় না। হ্যাঁ, কনকলতার হাসি দেখে আমার ভয় হল।

পর্য্যবেক্ষণের শক্তিটা আমার চিরকালই আছে। লোকের সাজসজ্জা দেখে, তার ভাব-ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে', তার মুখের দু-চারটে কথাবার্ত্তা শুনে প্রায়ই আমি তার স্বভাবের কথাটা বলে দিতে পারি। বন্ধুবান্ধবরা আমার এই শক্তি দেখে অনেকসময়ে আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন। অনেকে বল্‌তেন, ভালো ডিটেকটিভের যে-সব গুণ থাকা উচিত, আমার নাকি প্রচুর পরিমাণে তা আছে! কিন্তু যাক্ সে কথা।

—কনকলতার হাসি দেখে আর যে-ই ভুলুক, আমি ভুল্‌লুম না। আমার মনে একটা বিষম ধোঁকা লেগে গেল! সেই সন্দেহই আমাকে সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক করে' রাখ্‌লে!

কিছুদিন পরেই আমার সন্দেহ পরিণত হ'ল নিশ্চিত সত্যে।

সেদিন সকালবেলায় হাতে কোন কাজ না-থাকাতে, মোহিতের বাড়ীতে গেলুম। শুন্‌লুম মোহিত বেরিয়ে গিয়েছে আর কনক-লতার নাকি অসুখ করেছে। অসুখটা কি জান্‌বার জন্যে বাড়ীর ভিতরে গেলুম। আমার গলা পেয়ে কনকলতা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—"তোমার কি অসুখ করেচে কনক?"

—"অসুখ? এমন বিশেষ-কিছু নয়, মাথাটা বড্ড ধরেছে।" —এই বলে কনকলতা একটুখানি হাস্‌লে—অত্যন্ত ম্লান একটু হাসি। মনে হ'ল, সে-যেন অভিনয়-শ্রান্ত নটের প্রাণপণ-চেষ্টার হাসি!

হঠাৎ কনকলতার কপালের উপরে আমার চোখ পড়ে গেল। তার কপালের এক জায়গা কেটে গিয়ে ফুলে ঢিপি হয়ে উঠেছে!

ধাঁ-করে' আমার মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠ্‌ল—মুখ দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গেল—"তোমার কপালে ও কি !"

একটা চাপা কান্নার আবেগে কনকলতার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল ! কিন্তু তখনি সাম্‌লে নিয়ে সে আবার একটু হেসে বল্লে, "ও কিছু নয়—কাল আমার কপালটা জান্‌লায় ঠুকে গিয়েছিল কিনা—"

—"কনক, তুমি সত্যিকথা বল্‌ছ না। তোমার কপাল যেন জান্‌লায় ঠুকে গিয়েছিল—কিন্তু তোমার গলায়, হাতে অত কাল্‌শিরের দাগ কেন ?"

করুণ নয়নে আমার দিকে একবার তাকিয়েই সে মাথা নীচু কর্‌লে।

—"কনক, কে তোমায় মেরেছে, এমন পাষণ্ড কে আছে ?"

কনকলতা মাথা তুলে আবার মৃদু-মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু সে বোধহয় নিজেই জান্‌তে পার্‌লে না যে, তার চোখ দিয়ে তখন টস্‌টস্‌ করে' জল ঝর্‌ছে !

—"কনক, মুখের হাসি আর ত তোমার চোখের জলকে সাম্‌লাতে পার্‌লে না ! অনেকদিনই এ সন্দেহ করেছিলুম, আজ এতদিনে আমি বুঝতে পার্‌লুম, আমার সন্দেহ মিথ্যে নয় !"

—দু-হাতে আপনার মুখ ঢেকে দেয়ালের উপরে হেলে, বোবা পুতুলের মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি অনুতপ্ত স্বরে বল্লুম, "কে তোমাকে মেরেছে, তুমি না-বল্লেও আমি বুঝেছি।... আর এজন্যে আমিই দায়ী—তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছি আমিই !"

কনকলতা তখনো নির্ব্বাক।

—"তুমি জান-না কনক, তোমার দশা দেখে আমার বুকের ভেতরটা কী কর্‌ছে !......কিন্তু মোহিতকে আমি ছাড়্‌ব না—তোমার গায়ে সে হাত তুলেছে!"

—সঙ্গেসঙ্গে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কে উপরে উঠ্‌ছে।

পলক না-পড়্‌তে কনকলতা চোখের জল মুছে ফেল্‌লে! বিদ্যুতের মত আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি সে বলে উঠ্‌ল, "ঐ উনি আস্‌চেন! দোহাই আপনার—ওঁকে কিছু বল্‌লে আমি আর বাঁচ্‌ব না!"

উপরে উঠে, আমাদের দুজনকে সেখানে একসঙ্গে দেখে মোহিত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দুজনের দিকে বারবার সে তাকাতে লাগ্‌ল—বোধহয় ভাব্‌ছিল, কনকলতার মুখে তার কীর্ত্তি-কাহিনীর কতখানি আমি শুনেছি!

কনকলতা হাস্‌তে-হাস্‌তে সহজ স্বরে বল্লে, "তোমার কোর্টের বেলা হ'ল যে! যাও, যাও, তাড়াতাড়ি স্নান করে এস!"

কনকলতার হাসিমুখ ও সহজ স্বর মোহিতের সব ধুক্‌ধুকুনি ঘুচিয়ে দিলে। আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, আমার দিকে ফিরে সে বল্লে, "কি হে, তুমি কতক্ষণ?"

—"এই খানিকক্ষণ। এত সকালে বেরিয়েছিলে যে?"

—"একটা বেআক্কেল মক্কেলের পাল্লায় পড়ে ভোর না হ'তেই আমাকে বেরুতে হয়েছিল।"

—"আচ্ছা, তোমার বেলা হচ্ছে, আজ এখন আসি"—অনেক কষ্টে শান্ত স্বাভাবিক স্বরে এই কথা বলে, তাড়াতাড়ি আমি বিদায় হলুম। আর বেশীক্ষণ থাক্‌লে হয়ত আমি মাথা ঠিক রাখ্‌তে পারতুম না—কনকলতার মত অভিনয়ে আমার দক্ষতা ছিল না!

... ...

... ...

বাড়ীতে এলুম পাথরের মতন ভারি মন নিয়ে। স্বার্থপর আমি—নিজের ক্ষুদ্র তৃপ্তির জন্যে একটি সুন্দর জীবনকে অসার্থক করে' দিলুম!

কিন্তু মোহিতকে আমি একেবারেই চিন্‌তে পারি-নি—এমন অমানুষ সে! স্কুলে সে ভিজে বেড়াল হয়ে আমাদের গোলামের মত থাক্‌ত, আমরা তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আন্‌তুম না। তারপর সেই লোক যে ভিতরে-ভিতরে এ-হেন সয়তান হয়ে দাঁড়াতে পারে—কে এ-কথা ভেবেছিল? কনকলতার বিবাহের উদ্যোগে ভয় পেয়ে, তাড়াতাড়িতে মোহিতের সঙ্গে আমি তার সম্বন্ধ করেছিলুম, মোহিতের বর্ত্তমান চরিত্র কেমন সে খোঁজ কিছুই নেওয়া হয়-নি। নিজের এই সাংঘাতিক ভ্রমের জন্যে অনুতাপে আজ আমার বুক ভেঙে যায়-যায় হ'ল!

সেইদিন সন্ধ্যাতেই আর-এক অভাবিত ব্যাপার! কনকলতার কাছ থেকে এক পত্র পেলুম!

সে লিখেছে—

"প্রিয় মাষ্টারমশাই,

আজ আপনি স্বচক্ষে যা দেখে গেছেন—তারপরে আর কোন

কথা লুকোনো চলে না। কারণ, এখনো লুকোচুরি কর্‌তে গেলে, আপনি হয়ত এমন একটা-কিছু করে' ফেল্‌বেন, যার ফল ভালো হবে না।

আমার জীবন সুখের নয়,—আপনার কাছে এ-কথা আর লুকোনো মিছে। যখন কুমারী ছিলুম তখন বিবাহের যে স্বপ্ন আমার তখনকার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে' রেখেছিল, এখন সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে, একেবারে স্বপ্নেরি মতন!

সংসারে যে-দুটি দোষকে সকল নারীই সব-চেয়ে-বেশী ভয় করে, আমার স্বামীর—আপনার বন্ধুর—ঠিক সেই দুটি দোষই পুরোমাত্রায় আছে। তিনি মদ খান, আর এমন জায়গায় যান যার নাম না-কর্‌লেও আপনি বুঝ্‌বেন। শুনেছি 'নারীর প্রাণে সবই সয়'। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্বামীর এ স্বভাব সর্ব্বংসহা নারী হয়েও আমি সয়ে উঠ্‌তে পারি-নি। তাই দু-চার কথা না-বলে থাক্‌তে পারি না। সেটা যে স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামী তা বোঝেন না। তাঁর যুক্তি 'পুরুষের কথায় মেয়ের থাক্‌বার দরকার কি?' তিনি আমাকে চুপ্‌ কর্‌তে বলেন, চুপ না-কর্‌লে আমাকে গালি দেন, আমাকে ধমক দেন, আমাকে—আর যা করেন, তার চিহ্ন আজ সকালে আপনি দেখেছেন।

এম্‌নি ভাবে আমার দিন যাচ্ছে। বাবা মা কিছু জানেন না—তাঁদের একমাত্র সন্তান, আমার কষ্ট তাঁদের বুকে বাজের মত বাজ্‌বে। এ-সব কথা জান্‌লে তাঁরা স্নেহের বশে যা কর্‌বেন, তাতে আমার কষ্ট বাড়্‌বে বৈ কম্‌বে না। সকল দিক বুঝে আমি তাই মৌনব্রত নিয়েছি।

বাবা-মা একালের নব্যতন্ত্রের লোক—আমিও শিক্ষা পেয়েছি

তাঁদেরি মতন। কিন্তু তাহ'লেও এ-কথা ভোলা শক্ত যে, আমি হিন্দুর মেয়ে। আপনি হয়ত ভাব্‌বেন, তবে আমি স্বামী-নিন্দা কর্‌ছি কেন? ওটা হয়ত একালের শিক্ষার দোষ! স্বামীনিন্দা করি আর যাই-ই করি, স্বামী-ত্যাগ ত আর কর্‌তে পার্‌ব না!— যদিও সেটা পার্‌লে ভবিষ্যতে পরলোকে যত যন্ত্রণাই হোক্, আপাতত ইহলোকের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারি—তবু তা যখন সম্ভব নয় তখন মৌনব্রতই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

অতএব আপনিও আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমার স্বামী যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পান যে, আপনি সব জেনেছেন। স্বামীকে কিছু বলেও তাঁকে আর বদ্‌লানো যাবে না—তাঁর চরিত্র এখন সংশোধনের অতীত। আপনি কিছু বল্লে হিতে-বিপরীত হবে।

আর-এক কারণে আপনাকে নির্লিপ্ত থাক্‌তে বল্‌ছি। সঙ্কোচে আমার কলম থেমে যাচ্ছে, কিন্তু আমার নিজের মঙ্গলের জন্যে না-লিখেও আর অন্য উপায় নেই।

আমার স্বামী আপনাকে সন্দেহ করেন ... ... আমাকে সন্দেহ করেন!

এর কারণ জানি না। সুধু এইটুকু বুঝ্‌ছি যে, আপনি কিছু বল্‌তে গেলে তাঁর এই অন্যায়, কদর্য্য সন্দেহকে তিনি সত্য বলে মনে কর্‌বেন। ইতি আপনার ছাত্রী।"

কনকলতার পত্র হাতে করে' আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম।

* * * *

তারপর একসপ্তাহ কেটে গেল। এর-মধ্যে আমি কনকলতার

আর-কোন খোঁজখবর নিই-নি, মোহিতের সঙ্গেও দেখা করি-নি। কী যন্ত্রণায়, কী দুশ্চিন্তায় এই সপ্তাহকাল কাটিয়েছি, তা শুধু আমি জানি আর জানেন আমার ভগবান।

কনকলতার সেই পত্রের অক্ষরগুলো ঠিক জ্বলন্ত কয়লার মত আমার সমস্ত বুকখানা যেন দগ্ধে ছাই করে' দিচ্ছে! আমার চোখে এত অশ্রু নেই যে, সে আগুন নিবিয়ে ফেল্‌তে পারি!

মোহিত আমাকে আর কনকলতাকে সন্দেহ করে!

হ্যাঁ, কনকলতাকে আমি ভালোবাসি—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমার এ প্রেম আমি ছাড়্‌তে পারব না—এ প্রেম আমার জীবন-প্রদীপে উজ্জ্বল শিখার মত জ্বল্‌ছে, দিবারাত্র জ্বল্‌ছে!... ... কিন্তু, ঈশ্বর সাক্ষী, আমার এ প্রেম নিষ্কলঙ্ক! বিবাহের পরে কনকলতার কাছে আমি কোনদিন মুহূর্ত্তের জন্যেও, ভাবে-ভঙ্গীতে কি ব্যবহারে-ইঙ্গিতে আমার প্রেমকে প্রকাশ করি-নি। আর কনকলতা? আজ পর্য্যন্ত জানি, তার মনে আমার প্রেমের ঠাঁইটুকুও নেই। একজন পরিচিত আত্মীয়ের মত আমাকে সে গ্রহণ করেছে মাত্র!

তবে, মোহিতের এই সন্দেহের কারণ কি? অনেক ভাবলুম, কিন্তু কোনই কূল-কিনারা পেলুম না। খালি এইটুকু বুঝলুম, মোহিতের বাড়ীতে আর যাওয়া উচিত নয়।

এম্‌নি যখন মনের গতিক, তখন হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় মোহিতের বাড়ী থেকে এক দরোয়ান এসে হাজির। মোহিত আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে; বিশেষ দরকার, এখনি না-গেলে নয়। ব্যাপার কি?

ভাবৃতে-ভাবৃতে মোহিতের বাড়ীতে গেলুম। শুন্‌লুম, সে তিনতলায় ছাদের উপরে আছে।

ছাদে গিয়ে দেখলুম, এককোণে আল্‌সেতে হ্যালান দিয়ে মোহিত শীতলপাটির উপরে চুপচাপ বসে আছে। তার সাম্‌নে একটা বিলাতী মদের লেবেল-মারা বোতল, একটা কাঁচের গেলাস, আর-একখানা থালায় করে' কি-কতকগুলো খাবার।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমার সাম্‌নে এ-হেন ব্যাপার এই প্রথম। হঠাৎ মোহিত এতটা বেহায়া হয়ে উঠ্‌ল কেন?

তার সুমুখে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "মোহিত, তুমি আমায় ডেকেছ?"

মোহিত অত্যন্ত নীরস স্বরে বল্লে, "হ্যাঁ, বোসো ঐখানে।"

আস্তে-আস্তে বস্‌লুম। খানিকক্ষণ কেটে গেল। মোহিত আমার দিকে আর চেয়ে দেখ্‌লে না, কথাও কইলে না—খালি নিজের মনে থেকে-থেকে মদের গেলাসে চুক্‌চুক্ করে' চুমুক মার্‌তে লাগ্‌ল।

শেষটা বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "মোহিত, তোমার মদ-খাওয়ার সাক্ষী হ'তে আমি এখানে আসি-নি, আমার অন্য কাজ আছে!"

মোহিত অবহেলা-ভরে বল্লে, "বটে! অন্য কাজ আছে? কি কাজ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাও?"

—"ধর, তাই।"

—"তাহলে নিরাশ হবে। সে আজ নেমন্তন্ন খেতে গেছে।"

—"তবে তুমি মদ খাও, আমি বাড়ী যাই। অকারণে বসে-বসে মাতালের মদ-খাওয়া দেখ্‌তে আমার একটুও আগ্রহ নেই।"

আমি উঠ্‌তে যাচ্ছি, মোহিত সশব্দে গেলাসটা নামিয়ে রেখে কর্কশ স্বরে বলে' উঠ্‌ল, "বোসো বল্‌ছি, তোমার সঙ্গে আজ আমার বোঝাপড়া আছে!"

মোহিতের গলা শুনে অবাক হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। চাঁদের আলোয় দেখ্‌লুম, তার চোখদুটো হিংস্র পশুর মত জ্বল্‌ছে!

—"ভাখো, তুমি অনেকদিন আমার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছ—আর তা হচ্ছে না।"

—"তুমি কি বল্‌ছ মোহিত!"

—"ও-সব ন্যাকামি রাখ, আমি ওকালতি করি—বদ্‌মাইস্‌ ঠেঙিয়ে খাই। বাঙ্‌লায় এত পাত্র থাক্‌তে যখনি তুমি যোগাড়যন্ত্র করে' আমার সঙ্গে তোমার ছাত্রীর বিয়ে দাও, তখন থেকেই আমি তোমাকে সন্দেহ করি—বুঝেছ?"

এই আচম্‌কা আক্রমণের জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না, হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম—কোন কথা কইতে পার্‌লুম না!

—"অন্য-কোন অচেনা জায়গায় বিয়ে হ'লে পাছে তোমার প্রেমের পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায়, সেই ভয়েই তোমার ছাত্রীটিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ,—হুঁঃ, এ আমি বিলক্ষণ বুঝেছি!"

ততক্ষণ আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে আমি বল্লুম, "মোহিত!"

হা হা করে' হেসে মোহিত বল্লে, "তুমি চোখ রাঙাচ্ছ কাকে হে? আমাকে তুমি এখনো সেই পাড়াগেঁয়ে ভূত মনে কর নাকি?"

—"মোহিত, এমন পাপ-মন নিয়ে তবে তুমি আমার কথায় বিয়ে কর্‌লে কেন ?"

—"টাকার লোভে আর রূপের মোহে। এ ফাঁদে জেনে-শুনেও সবাই পা দেয়—"

—"থামো, থামো—"

—"আমি যীশুখৃষ্ট কি বুদ্ধদেব নই, সুতরাং শয়তানের প্রলোভনে সহজেই ভুলেছি।"

—"এ মিথ্যেকথা মোহিত, এ মিথ্যেকথা !"

—"বটে ! এ চিঠিখানাও কি মিথ্যে ? ছাখো, চাঁদের আলোয় তোমার জিনিষকে তুমি বোধহয় চিন্‌তে পার্‌বে !"—এই বলে মোহিত আমার দিকে একখানা কাগজ এগিয়ে ধর্‌লে।

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে কাগজখানার উপরে চোখ পড়্‌তেই চিন্‌লুম, সে আমারি চিঠি—বিয়ের আগের দিনে কনকলতাকে যে চিঠি লিখেছিলুম !

বল্‌বার কিছু না-পেয়ে চোরের মতন আমি মাথা হেঁট কর্‌লুম।

—"কি, চুপ করে' রইলে যে ? এ চিঠিও কি মিথ্যে ? বল, —কথা কও, শুন্‌ছ ?"

রুদ্ধকণ্ঠে কাতরস্বরে আমি বল্‌লুম, "হাঁ, এ আমারি চিঠি মোহিত !"

—"এখন পথে এস বাবা, পথে এস !"

—"মোহিত, আমি মান্‌ছি, আমারি সব দোষ। কিন্তু কনকলতাকে এর জন্যে তুমি দায়ী কোরো না। ভগবানের নাম নিয়ে বল্‌ছি, সে নির্দ্দোষ।"

—"হ্যাঁ, সে সীতা-সাবিত্রী! তা নইলে পরপুরুষের একখানা প্রেমপত্র নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখে ছায়!...... এ-সব কথা বোঝাচ্ছ কাকে? কনক যদি খাঁটি হ'ত, তাহলে এ চিঠি পেয়েই সে হয় ঘৃণায় তখনি ছিঁড়ে ফেলে দিত, নয় তার বাপ-মাকে গিয়ে দেখাতো,—তারপর দূর করে' তোমাকে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু তার কিছুই সে করে-নি, উল্টে চিঠিখানা এতদিন ধরে হীরে-মাণিকের মত যত্ন করে' বাক্সে তুলে রেখেছে, আর তোমার সঙ্গে সমান হাসিমুখে মেলামেশা করে' এসেছে! এই চিঠির সঙ্গে তার বাক্সে আর কি পেয়েছি জান? তোমার ফটো!"

হায় মানুষের প্রাণ! এই ভয়ানক সময়েও আমার সকল ভয় লজ্জা অপমান ভুলে আনন্দের আবেগে আমি আকুলব্যাকুল হয়ে গেলুম! মোহিতের কথায় আজ আমি এই প্রথম জানতে পারলুম, **কনক আমায় ভালোবাসে—কনক আমায় ভালোবাসে!** বিপদের মধ্য দিয়ে এই অমূল্য বার্ত্তা এসে, সুখের আবেশে আমাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিলে!

কিন্তু সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নের মধ্য থেকে মোহিতের ক্রোধকম্পিত স্বর আচম্বিতে আমাকে সচকিত করে' তুল্লে,—"চুপ করে' ভাবছ কি? তোমরা আর আমাকে ভোলাতে পারবে না—বুঝেছ? দৈব আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে—তা-নইলে কনক নেমন্তন্নে যাবার সময়ে ভুলে বাক্সটা খুলে রেখে যাবে কেন?... ...হ্যাঁ, তোমাদের স্বপক্ষে-বিপক্ষে যত কথা থাকতে পারে, সব আমি একে-একে ভেবে দেখেছি। ভেবোনা, মদ খেয়ে আমি মাতাল হয়েছি—না, আমার মাথা যতদূর ঠাণ্ডা থাকবার তা আছে।

নইলে আমার সাম্‌নে বসে এতক্ষণ তুমি বেঁচে থাক্‌তে না”
—বল্‌তে বল্‌তে মোহিতের চোখদুটো আবার দপ্‌দপ্‌ করে’
উঠ্‌ল!

হঠাৎ নীচের রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হ’ল—শব্দটা মোহিতের বাড়ীর সাম্‌নে এসেই থাম্‌ল।

মোহিতও কাণ পেতে শুন্‌ছিল। অট্টহাস্য করে’ সে বলে উঠ্‌ল, “ঐ তোমার ছাত্রী ফিরে এল! এতক্ষণ তা’রি অপেক্ষায় ছিলুম!”

ভয়ে শিউরে উঠে আমি বল্লুম, “মোহিত, মোহিত, তুমি কি কর্‌তে চাও?”

উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করে’ সে বল্লে, “এখনি দেখ্‌তেই পাবে!”

—“তুমি—তুমি কনককে কি মার্‌বে?”

—“সুধু মার্‌ব না, আমার বাড়ী থেকে এখনি তাকে দূর করে’ তাড়িয়ে দেব—সেইসঙ্গে তোমাকেও!”

—“কথা শোনো মোহিত, কথা শোনো! কনকের সর্ব্বনাশ কোরো না না, কোরো না! মনের সঙ্গে যুঝে সে আপনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তবু আমাকে তার মন জান্‌তে দেয়-নি—তুমি না-বল্লে আমি আজ যা জেনেছি কখনোই তা জান্‌তে পারতুম না! তার এ আত্মসংযমকে তুমি ব্যর্থ করে’ দিও না—তাকে মেরে-ধরে’ কলঙ্কিনী বলে তাড়িয়ে দিয়ে সমাজে তাকে পতিত কোরো না—তার—তার—”

—“তোমার শয়তানী রাখো! এই আমি চল্লুম!”

—“তার চেয়ে আমাকে মারো, আমাকে অপমান কর—

আমাকে তাড়িয়ে দাও, যা-ইচ্ছে কর, আর আমি তোমার পথে এসে দাঁড়াব না,—মোহিত, মোহিত !”

কিন্তু নিষ্ঠুর মোহিত আমার কাকুতিতে কর্ণপাতও করলে না, বিকট স্বরে একটা উচ্চ হাস্য করে’ তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ’ল !

পর-পলকে আমার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ল, রাজপথে কৌতূহলী জনতার মাঝখানে,—বিতাড়িত, প্রহারে-জর্জরিত, পদ-দলিত কনকের রক্তরাঙা, লাঞ্ছিত, আর্ত্ত মুখ !

একলাফে আমি মোহিতের সুমুখে গিয়ে পড়্‌লুম এবং দু-হাতে তার হাত চেপে ধরে বল্লুম, “খবর্দ্দার ! এখান থেকে তুমি এক পাও নড়্‌তে পার্‌বে না !”

মোহিত এক-হ্যাঁচকায় আমার হাত ছাড়িয়ে পিছু হঠে যেতে গেল—এবং পরমুহূর্ত্তেই প্রাচীরহীন ছাদের আল্‌সেতে পা-লেগে, টাল্ সাম্‌লাতে না-পেরে তার দেহটা একেবারে রাস্তার দিকে ঘুরে পড়্‌ল,—কিন্তু তাড়াতাড়ি ছাদের কার্ণিশটা ধরে ফেলে সে শূন্যে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল !

চোখের নিমেষে এই ঘটনা ঘটে গেল !

মোহিত কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, “ধর—ধর—বাঁচাও, পড়ে গেলুম—গেলুম—”

স্থির-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে; বুকের উপরে দু-হাত বেঁধে, কঠিন পাষাণের মত অটল হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তাকে আমি অনায়াসেই বাঁচাতে পার্‌তুম—কিন্তু **সে বাঁচ্‌লে আমার কনক মর্‌বে।** প্রাণের ভিতরে কাণ পেতে

বিবেকের আদেশ শুন্‌তে পেলুম—কিন্তু আমার দেহ তখন এক অভাগী নারীর মুখ চেয়ে তেম্‌নি আড়ষ্ট হয়েই রইল!

মোহিত ছাদে ওঠ্‌বার জন্যে প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি কর্‌তে-কর্‌তে পাথর-গলানো স্বরে বল্‌লে,—"ফণী, এস ভাই! আমার হাত-দুটো ধর—"

আমার ভয় হ'তে লাগ্‌ল, পাছে তার করুণ মিনতি শুনে আমার প্রাণে শেষটা দয়ার সঞ্চার হয়!

মোহিত তার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে' আর-একবার উপরে ওঠবার চেষ্টা কর্‌লে—কিন্তু তার দেহের ভার সইতে না-পেরে কার্ণিশের খানিকটা হঠাৎ হুড়্‌মুড়্‌ করে ভেঙে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে মোহিতকে আর দেখ্‌তে পেলুম না,—কেবল শুন্‌লুম এক আকাশ-ফাটানো শেষ-আর্ত্তনাদ, আর রাস্তা থেকে অনেক লোকের চীৎকার! ... ...পরলোকে মোহিতের অতৃপ্ত প্রতিহিংসা আমার জন্যে অপেক্ষা করে' আছে কিনা, জানি-না—কিন্তু ইহলোকে তাকে আর-কখনো দেখ্‌তে পাই-নি।

কনকলতা এখন কোথায়, তাও জানিনা,—বিধবার শুভ্রবেশে তাকে দেখ্‌বার আগেই আমি দেশত্যাগী হয়েছিলুম।

হাতে নর-রক্ত মেখে সংসার ছেড়ে বেরিয়েছি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্যে। আমার এ হত্যাকারীর হাত আর কি জীবনে শুভ্র হবে?"

... ...

সন্ন্যাসী আমার দিকে আর দৃষ্টিপাত না-করেই চকিতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়ে, যেখানে ধূ-ধূ ময়দানের

প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নার উপরে, একটি নিঃসঙ্গ বটের নিস্পন্দ ছায়ায় জমাট অন্ধকার স্তম্ভিত হয়ে ছিল, তারই ভিতরে অলৌকিক ছায়া-মূর্ত্তির মত মিলিয়ে গেলেন।



"পাথর ফ্যট্ কর্ দরিয়া ছুটে !"

(ক)

রমেশের মতে গরম যখন চরম হইয়া উঠে এবং বিশুদ্ধ বাতাস না-পাইয়া প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়ি খাঁচা-ছাড়ি করিতে থাকে, বিকালে তখন গড়ের মাঠের 'কার্জন-পার্কে' গিয়া হা-করিয়া হাঁপ্ ছাড়াই, বাঁচিবার পক্ষে সব-চেয়ে প্রশস্ত এবং সহজ উপায়। অতএব, তারা কয় বন্ধুতে প্রত্যহ এই প্রশস্ত এবং সহজ উপায় অবলম্বন করিত।

সেদিনও তারা 'কার্জন-পার্কে' গিয়া জমিয়াছিল।

রমেশ ঘাসের উপরে উড়ানি বিছাইয়া শুইয়াছিল, যোগেশ একটা মৌরির বিঁড়ি বারংবার নিবিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্রমেই চটিয়া উঠিতেছিল, সুরেশ একমনে একখানা বিলাতী ডিটেক্টিভ্ উপন্যাস পড়িতেছিল এবং উমেশ সকৌতুকে দূরের এক বেঞ্চের দিকে স্থিরচক্ষে তাকাইয়াছিল;—সেই বেঞ্চখানার উপরে দু-জোড়া সাহেব-মেম বসিয়াছিল—তার মধ্যে যে সাহেবটি তাকিয়ার মত মোটা তাঁর মেমটি বাঁখারির মত রোগা, আর যে সাহেবটি বামনের মত বেঁটে তাঁর মেমটি প্রায় জিরাফের মত ঢ্যাঙা—এমন বিসদৃশ চার-চারটি চেহারা এক জায়গায় দেখিতে পাওয়ার সৌভাগ্য, বড়ই দুর্লভ!

হঠাৎ পিছন হইতে চেনাগলায় একজন বলিল, "ওহে, আমি যে তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলুম!"

সবাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখিল, পরেশ। অমনি একসঙ্গে প্রশ্ন হইল, "কিহে, তুমি না পুরী গিয়েছিলে?" "কবে ফিরলে হে?" "জায়গাটা কেমন লাগ্‌ল?" "আর কোথাও গিয়েছিলে নাকি?"

পরেশ আগে সকলকার মাঝখানে আসিয়া বসিল। তারপর কোঁচানো উড়ানিখানি খুলিয়া সাবধানে কোলের উপরে রাখিয়া বলিল, "ভাই, আমি চতুর্মুখ নই, সুতরাং একসঙ্গে তোমাদের চার-চারটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে একে একে বল্‌চি শোন। হ্যাঁ, আমি পুরী গিয়েছিলুম। আজ সকালে ফিরেছি। জায়গাটা ভালোই লাগ্‌ল—দোষের মধ্যে আমাদের কালো রং সেখানকার জল-হাওয়ায় ঘোরতর হয়ে ওঠে। পুরী থেকে আমি কণারকে গিয়েছিলুম—"

রমেশ চম্‌কাইয়া বলিল, "অ্যাঁঃ, কণারকে!"

—"ওকি, কণারকের নামে তুমি অমন চম্‌কে উঠ্‌লে কেন?"

—"না, না, ও কিছু নয়, তুমি যা বলছিলে বল!"

—"সে হবে না! আগে বল তুমি চম্‌কালে কেন"

—"সে অনেক কথা!"

—"তাহোক্—বল!"

—"শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে না!

—"যদি ভালো লাগে আর মাসিকপত্রের ছোটগল্পের মতন চর্ব্বিত-চর্ব্বণ না-হয়, তাহলে আমরা উনিশবার জেল-ফেরতা দাগী চোরের কথাও বিশ্বাস করতে রাজি আছি!"

—"কিন্তু—কিন্তু—"

—"কিন্তু তুমি বড় বেশী ল্যাজে খেল্‌চ রমেশ !"

অগত্যা বাধ্য হইয়া রমেশ তার কথা সুরু করিল :—

(খ)

"অনেকদিন আগেকার কথা ; আমরা কয় বন্ধুতে কণারক দেখতে গিয়েছিলুম। কণারকের মন্দিরের কথা তোমরা অনেকেই জান, সুতরাং আমি আর মন্দিরের কথা বল্‌তে চেষ্টা করব না।

কণারকের আশেপাশে মাঝে-মাঝে দু-চারখানি ছোটখাট গাঁ আছে ; এ-সব গাঁয়ে লোকজন খুব কম, যারা থাকে তারা হচ্ছে চাষাভুষো ও গয়লা শ্রেণীর।

কণারক থেকে যেদিন আমাদের আস্‌বার কথা, সেইদিন সকালে আমরা অম্‌নি একখানি গাঁয়ের ধার দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিলুম।

কৌতূহলী চোখে এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে আস্‌ছি, হঠাৎ একটা গাছতলায় পুতুলের মত কি-একটা নজরে ঠেক্‌ল্‌। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই এক পাথরের মূর্ত্তি—তার নীচের দিকটা বালিতে পুঁতে গিয়েছে।

মূর্ত্তিটি রমণীর—গড়ন দেখে মনে হোলো, কণারকের সেকেলে শিল্পীদেরই কেউ এটিকে গড়েছে ! কেননা, তেমন রূপে-ভরা দেহ, হাসি-ভরা মুখ, ভাবে-ভরা চোখ বড় যে-সে কারিকরের কল্পনায় সম্ভব নয়,—উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্পের এটি একটি জলন্ত নিদর্শন।

এ-হেন মূর্ত্তি এখানে অযত্নে পড়ে আছে কেন, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাই ভাব্‌ছি, এমন সময়ে দেখি "আস্থছত্তি ব্রজবাসী"

ব'লে গান গাইতে-গাইতে, পাশ দিয়ে একজন গাঁয়ের লোক যাচ্ছে।

তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁরে, এ পুতুলটা এখানে পড়ে আছে কেন?"

উড়িয়া-ভাষায় সে যা বললে তার মর্ম্ম বুঝলুম এই যে, গাঁয়ের মধুসূদন শ্রীচন্দনের বাড়ীতে এ মূর্ত্তিটা আগে ছিল, কিন্তু সে মরে যাবার পর তার ছেলেরা এটাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।

—"ফেলে দিয়ে গেছে? কেন?"

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে লোকটা বল্‌লে, কেন সে তা জানে না। তার মুখ দেখে মনে হোলো, সে যেন কি লুকোচ্ছে!

—"আচ্ছা, তুই এই পুতুলের গা থেকে বালিগুলো সরিয়ে ফ্যাল্ দেখি! বথ্‌শীষ পাবি।"

লোকটা কেমন শিউরে উঠে তিনহাত পিছিয়ে গেল। তারপর, দংশনোদ্যত সাপের দিকে লোকে যেমন ক'রে তাকায়, তেমনি ভীরু চোখে মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, সে পারবে না!

থাম্‌কা লোকটা আঁৎকে উঠ্‌ল কেন? মূর্ত্তিটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিকে তার পাষাণ নয়ন্ তুলে সে যেন করুণ হাসি হাস্‌ছে; আপনার নীরব ভাষায় যেন বল্‌ছে, 'আমাকে উদ্ধার কর —এই আসন্ন সমাধি থেকে আমাকে উদ্ধার কর!'

লোভে আমার মনটা ভরে গেল। অপূর্ব্ব শিল্পের এই উজ্জ্বল রত্নটিকে যদি কল্‌কাতায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার বাড়ী আলো হয়ে উঠ্‌বে।

ফিরে দেখি, পিছনে সে লোকটা আর নেই, হন্‌হন্‌ ক'রে তাড়াতাড়ি সে গাঁয়ের দিকে চলে যাচ্ছে।

বন্ধুরাও আমাকে ফেলে অনেকদূরে এগিয়ে গেছেন, চেঁচিয়ে ডাকাতে সবাই ফের ফিরে এলেন।

সকলে মিলে বালি সরিয়ে মূর্ত্তিটিকে আবার টেনে তুললুম। সেটি একটি নর্ত্তকীর নগ্ন মূর্ত্তি; এতক্ষণ তার আধখানা বালির ভিতরে ঢাকা ছিল বলে তার অপরূপ রূপ ভাল করে বুঝ্‌তে পারি-নি, এখন তার সবটা দেখতে পেয়ে আমাদের চোখে যেন তাক্‌ লেগে গেল! কী সুন্দর তার দাঁড়াবার ভঙ্গী, কী অপূর্ব্ব তার হাত-পায়ের শ্রী-ছাঁদ! আর পাথরের মূর্ত্তি যে এতটা জীবন্ত হোতে পারে আমি তা জানতুম না; মনে হোলো, শিল্পী আর-একটু চেষ্টা কর্‌লেই এর মৌনব্রত ভঙ্গ হয়ে যেত!

ভেবেছিলুম, মূর্ত্তিটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে গেলে, গাঁয়ের লোকে নিশ্চয়ই উড়িয়া-ভাষায় যৎপরোনাস্তি রুদ্ররস প্রকাশ কর্‌বে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কেউ টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত কর্‌লে না!

(গ)

"সন্ধ্যার পর আমরা কণারকের কালো দেউলের কালো ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে সীমাহীন বালুকা-সাগরের তীরে এসে দাঁড়ালুম!

আমরা চারখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করেছিলুম। অন্য তিনখানা গাড়ীতে দু-জন করে লোক উঠল, কিন্তু আমার গাড়ীতে সেই মূর্ত্তিটি ছিল বলে আমি ছাড়া আর কারুর জায়গা হোলো না।

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ঘুমন্ত সেই অনন্ত বালু-প্রান্তরকে চাকার শব্দে জাগ্রৎ করে, গরুর গাড়ীগুলো ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। উপরে আকাশ, নীচে সেই ধূ-ধূ মরুভূমি—চারিদিকে আর কিছুই নেই—না গ্রাম, না মানুষ, না গাছপালা!

সারাদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে দেহ-মন দুই কেমন এলিয়ে পড়েছিল—আস্তেআস্তে গাড়ীর ভিতরে দেহটাকে ছড়িয়ে দিলুম; আর, আমার পাশেই, নর্ত্তকীর সেই পাষাণ মূর্ত্তিটা, স্তব্ধ মৃত দেহের মত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল।...

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখ্‌লুম... ... সেই পাষাণী নর্ত্তকী যেন প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে! টানা টানা বিদ্যুৎভরা চোখ তুলে আমাকে তার পাশে দেখতে পেয়ে, কুন্দদন্তে অধর চেপে ফিক্ করে সে হেসে ফেল্‌লে, তার পর সামনের দিকে ধীরে-ধীরে তার দু-হাত বাড়িয়ে দিলে—আমাকে আলিঙ্গন কর্‌বার জন্যে!

সেই জীবন্ত পাষাণীর আলিঙ্গন থেকে তাড়াতাড়ি যেমন সরে আস্‌তে যাব—অম্‌নি চট্ করে ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ কচ্‌লে উঠে বসে দেখি, পাথরের প্রতিমূর্ত্তিটা গাড়ীর ভিতরে পাত্‌লা অন্ধকারে আবছায়ার মত দেখা যাচ্ছে; হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় সে মূর্ত্তি যেন এক ঘুমন্ত মানুষের! বাইরে, মড়ার মত হল্‌দে আধখানা চাঁদ একরাশ এলমেলো কালো মেঘের উপরে স্তম্ভিত হয়ে আছে। গভীর রাত্রি অত্যন্ত স্তব্ধ;—কেবল, খুব দূর থেকে চিরজাগন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত হাহাকার বাতাসের ঠাণ্ডা দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে ভেসে-ভেসে আস্‌ছে!

হঠাৎ আমার কাণে একটা শব্দ গেল। গাড়ীর ভিতরে কে

ফোঁশ করে একটা নিশ্বাস ফেল্‌লে! প্রথমে ভাবলুম, আমার ভ্রম। কিন্তু তারপর ভাল করে শুনে বুঝলুম,—না, ভ্রম নয়, ভিতর থেকে নিশ্চয় কারুর নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে!

গাড়োয়ান-ছোঁড়াটা তখন নেমে গাড়ীর আগে-আগে হেঁটে চল্‌ছিল।

প্রতিমূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লুম, সে তেমনি স্থিরভাবে পড়ে আছে।—

ধাঁ-করে মনে হোলো, কণায়কের সেই গেঁয়ো-লোকটার রহস্য-পূর্ণ আচরণ। বখ্‌শীষের লোভেও সে এই মূর্ত্তিটার গায়ে হাত দিতে রাজি হয়-নি! ... ... এ মূর্ত্তিটাকে নিয়ে কিছু গোলমাল আছে নাকি? নইলে, দেখ্‌তে যাকে এত সুশ্রী, তাকে গাছতলায় অমন-করে ফেলে-দেওয়া হয়েছিল কেন?

নিশ্বাস তখনো উঠ্‌ছে, পড়্‌ছে! সুধু তাই নয়—গাড়ীর ভিতরে বিছানার তলায় খড় বিছানো ছিল—সেই খড়গুলো হঠাৎ খড়্‌খড়্‌ করে উঠ্‌ল—কে যেন এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরে শুল।

আমি ভূত মানি না। কিন্তু তবু কেন জানি না, আমার বুকের কাছটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করে উঠ্‌ল!. গাড়ীর ভিতরপানে চাইতে আর ভরসা হোলো না,—খালি মনে হোতে লাগ্‌ল, যেন কার দু-দুটো পাথুরে চোখের থম্‌থমে চাহনি ধারালো ছুরির কন্‌কনে ফলার মত ক্রমাগত আমার পিঠের উপরে এসে বিঁধছে আর বিঁধছে! শেষটা এমনি অস্বস্তি হোতে লাগ্‌ল যে, আমি আর কিছুতেই সেখানে তিষ্ঠতে পারলুম না,—এক লাফে সে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে অন্য এক গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লুম। সেখানে আমার দুই বন্ধু

শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন ; গুঁতোগুঁতি করে কোনগতিকে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলুম।

... ...

ভোর হোলো। প্রান্তর তখনো শেষ হয়-নি।

নিজের গাড়ীতে ফিরে আস্‌তেই দেখি, আমার বিছানার উপরে একটা কুকুরছানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে, নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে !

কাণ ধরে সেটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিলুম। ছানাটা কেঁউ-কেঁউ করে উঠ্‌তেই গাড়োয়ান-ছোঁড়া ছুটে এল। বল্‌লে, "বাবু, মের-না মের-না, ও আমার কুকুর !"

—"তোর কুকুর !"

—হ্যাঁ বাবু, ওর মা মরে গেছে—তাই ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ীতেই থাকে !"

বুঝ্‌লুম, গেল রাত্রে গাড়ীতে কার নিশ্বাস শুনেছিলুম ! কিন্তু তবু—

(ঘ)

"কল্‌কাতায় এসে নর্ত্তকীর সেই প্রতিমূর্ত্তিটিকে আমার বাইরের ঘরের একটি ছোটে টেবিলের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

আমার স্ত্রী তাকে দেখবার জন্য একদিন বাইরের ঘরে নেমে এলেন। অনেক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখে তিনি মত-প্রকাশ করলেন, "একে বাইরের ঘরে রাখা চলবে না।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে "বল্‌লুম, কেন ?"

"কেন আবার! ওর পরোনে যে কাপড় নেই! মাগো, কি লজ্জা!"

—"ওঃ, তাই! কিন্তু রমা, তুমি কি জাননা যে, বড় শিল্পীরা যে-সব রমণীর মূর্ত্তি গড়ে নাম কিনেছেন, তার বেশীরভাগেরই গায়ে কাপড়-চোপড় নেই?"

—"কেন, তোমার বড় শিল্পীরা কি স্ত্রীলোককে এতই বেহায়া বলে মনে করেন?"

—"তা নয় রমা, তা নয়! অনাবৃত সৌন্দর্য্য যেমন স্বাভাবিক হয়, তেমন—"

—"থাক্ কথক-ঠাকুর, থাক্, তোমাকে আর সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে না, ও-সব হচ্ছে ভূয়ো কথা।"—এই বলে রমা আবার নর্ত্তকীর দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর ভঙ্গিভরে ব্যঙ্গ করে তার দিকে চেয়ে বল্লে, "মরে যাই, পরোনে কাপড় নেই—কালা-মুখীর দাঁড়াবার আবার ঢং দ্যাখ না—দি ঠাস্ করে গালে এক চাপড়!"—রমা মূর্ত্তির গালে সকৌতুকে একটি চড় বসিয়ে দিলে!

—কিন্তু সেই সঙ্গেই সে আর্ত্তনাদ করে দু পা পিছিয়ে গেল! আমি অবাক হয়ে দেখ্লুম, তার মুখ একেবারে পাঙাশ হয়ে গেছে!

—"কি হোলো রমা, অমন করে উঠ্লে কেন?"

—"আমার হাতে ও কাম্ড়ে দিয়েছে!"

—"কাম্ড়ে দিয়েছে! ক্ষেপে গেলে নাকি?"

—"ওকে চড় মারতেই ও-যেন আমাকে কটাস্ করে কামড়ে দিলে। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, হাত দিয়ে আমার রক্ত পড়্ছে!"

তাইত, রমার হাত দিয়ে সত্যিই রক্ত গড়াচ্ছে যে! হতভম্বের মত মূর্ত্তির দিকে চাইলুম—কিন্তু তখনি বুঝ্তে পারলুম আসল ব্যাপারটা কি! নর্ত্তকীর নাকের ডগাটি শিল্পী অত্যন্ত সূক্ষ্ম করে কুঁদেছে, রমার হাত তার উপরে গিয়ে পড়াতেই আঁচ্ড়ে গেছে আর-কি!

কিন্তু রমা বিশ্বাস করলে না। আমার মুখে সে আগেই শুনেছিল, এ মূর্ত্তিকে আমি কি-করে কেমন অবস্থায় পেয়েছিলুম। সে বল্লে, "একে যখন লোকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, তখন এ আপদকে ঘাড়ে করে বয়ে তোমার বাড়ীতে আন্বার দরকার কি ছিল?"

স্ত্রীলোকদের কী কুসংস্কার! আমি হেসে বললুম, "যাও, যাও, আর পাগলামি করতে হবে না—হাতে জল দাও-গে যাও!"

ভয়ে-ভয়ে নর্ত্তকীর দিকে তাকাতে তাকাতে রমা ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেল।

আমিও কিন্তু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নর্ত্তকীর দিকে চেয়ে রইলুম! রূপের-গরবে-ভরা হাসিমুখে, আমার দিকে দুখানি নিটোল বাহু বাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে,—যেন কার অভিশাপেই সে আজ নিশ্চল পাষাণে পরিণত হয়ে নিস্তব্ধ, নইলে ঐ মুখের কলহাস্যরোলে এবং ঐ চরণের রুণুঝুণু নূপুরনিক্কণে এতক্ষণে আমার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্ত!

(৬)

"বিনোদকে তোমরা সকলেই জান বোধ হয়। এখন তার যে ভয়ানক দশা হয়েছে, তার জন্যে দায়ী কে জান? নর্ত্তকীর ঐ প্রতিমূর্ত্তিটা! বিনোদ যদি ঐ নর্ত্তকীর প্রতিমা না দেখত, তাহলে

ভাল আঁকিয়ে বলে দেশ-বিদেশে আজ তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়্‌ত—সে একজন মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠ্‌ত!····· বিনোদের শোচনীয় পরিণাম তোমাদের কারুর অজ্ঞাত নেই, কিন্তু তার আসল কারণ খালি আমিই জানি।

বিনোদ কল্‌কাতায় থাকৃত না। কল্‌কাতায় যখন আসত তখন আমার বাড়ীতেই এসে উঠত। আমি ছিলুম তার সব-চেয়ে বড় বন্ধু।

সেবারে কল্‌কাতায় এসে সেবাদাসীর এই মুর্ত্তিটা দেখে, সে আনন্দে একেবারে বিভোর হয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্‌লে, "রমেশ, এ যে অমূল্য রত্ন! বন্ধু, তুমি লাখটাকা পেলেও আজ আমি এত খুসী হতুম না!"—বিনোদ কাছে দূরে আশপাশ সুমুখ ও পিছন থেকে নানারকমে ঘুরে-ফিরে প্রতিমূর্ত্তিটা দেখ্‌লে। তারপর তার গায়ের উপরে আপনার হাত রেখে আবার বল্‌লে, "এ সেই অতীতের বিশ্বকর্ম্মার গভীর সাধনার ফল, এ যুগের সাধ্য কি এমন প্রতিমা গড়তে পারে! দেখ বন্ধু, এর পাষাণদেহে কি অপূর্ব্ব সুষমা, হাত-পায়ের কি বিচিত্র ভঙ্গিমা!····· আমি যদি সম্রাট হতুম আর এ যদি মানুষ হ'ত, এর একটি চাহনির জন্যে আমি সাম্রাজ্য বিকিয়ে দিতুম! হায়, এ হচ্ছে পাষাণী—একে ভালোবাসলেও প্রতিদানে এর প্রেম ত আমি পাব না! তবু দেখ, এই পাষাণও শিল্পীর হাতের মায়াস্পর্শ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যেন এই কঠিন পাথরের আড়ালে-আড়ালে প্রাণের লুকানো ধারা চুপি-চুপি বয়ে যাচ্ছে—হাত দিলে যেন হাতে তার উত্তাপ পাওয়া যায়!"—

এই বলে বিনোদ সেই প্রতিমার বুকের উপরে হাত দিলে—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিদ্যুতাহতের মত হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

আচম্‌কা তার এই ভাবান্তর দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "কিহে, ব্যাপার কি ?"

বিনোদের মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হোলো না। তারপর একবার সেই মূর্ত্তির দিকে, আর-একবার আমার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল চোখে চেয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্‌লে, "একি সত্যি ?"

"কি সত্যি হে ?"

—"দেখ রমেশ, এই মূর্ত্তির বুকে যেম্‌নি আমি হাত রাখলুম, অম্‌নি আমার কি মনে হোল জান ? মনে হোলো, ওর বুকের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা দুপ্‌দুপিয়ে নেচে উঠ্‌ল !"

আমি উচ্চস্বরে হেসে বল্‌লুম, "মূর্ত্তিটা দেখে তোমার এত আনন্দ হয়েছে যে তুমি একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসে আছ !"

বিনোদ প্রতিমার বুকে আবার হাত দিয়ে একটু হেসে বল্‌লে, "তাই বটে—আমারি ভ্রম। কৈ, এখন ত আর তা মনে হচ্চে না—এ বুক এখন স্তব্ধ, স্থির, মৃত্যুর মত শীতল !" তারপর থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বল্‌লে, 'হায়রে, পাষাণকে কি বাঁচানো যায় ! তা যদি পারতুম, তাহলে আমরা,—শিল্পীরা, আজ শত শত নিখুঁত মানুষ গড়ে সমস্ত সংসারকে সুন্দর করে তুল্‌তুম !"

(চ)

"আমার একটি বদ্‌ অভ্যাস আছে। রাত অন্তত দেড়টা-দুটো

না বাজ্‌লে সহজে আমার ঘুম হয় না। প্রথম রাতটা আমি বই-টই পড়ে কাটিয়ে দি।

সে রাত্রে যখন পড়া সাঙ্গ করে উঠলুম, ঘড়িতে তখন দুটো বাজতে দশ মিনিট। আলো নিবিয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পেলুম।

এত রাত্রে জেগে কে? একটু আশ্চর্য্য হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিনোদ। বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত সে অস্থিরভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সে রাত্রে গরমটা পড়েছিল কিছু অতিরিক্ত; ভাব্‌লুম, গরমে বোধহয় তার ঘুম ভেঙে গেছে, তাই সে বাইরে বাতাস পাবার জন্যে বেরিয়ে এসেছে। এই ঠিক করে তাকে আর না-ডেকেই আমি শুয়ে পড়লুম।... ... ...

পরদিন সকাল-বেলায় বিনোদের সঙ্গে যখন দেখা হোলো, বল্‌লুম, "কিহে, কাল ভাল করে ঘুম হয়-নি বুঝি?"

সে বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "তুমি জানলে কি করে?"

আমি বল্‌লুম, "কাল রাত দুটোর সময় তুমি যখন বারান্দায় এসেছিলে আমি তখন জেগেছিলুম।"

বিনোদ আমার কাছে সরে এসে খুব মৃদুস্বরে বল্‌লে, "ভাই, কাল এক আশ্চর্য্য স্বপন দেখেছি।"

—"কি রকম?"

—"নর্ত্তকীর মূর্ত্তিটার একটা নকল তুল্‌তে তুল্‌তে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখ্‌লুম, জানো? দেখলুম প্রতিমা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল—যদিও তার দেহ যেমন ছিল তেমনি পাথরেরই রইল। এক পা এক পা করে আমার কাছে

এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে সে বল্‌লে, 'তোমার কথা আমি শুনেছি, তুমি আমাকে ভালোবাসতে চাও,—না'? আমি বল্‌লুম, 'হ্যাঁ'।—'তাহলে আমিও তোমাকে ভালোবাসব, আর কখনো ছাড়ব না'—এই বলে সে আমাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন কর্‌লে! তার সেই শক্ত পাথরের হাতের চাপে আমার দম যেন আট্‌কে আসতে লাগ্‌ল। জোর করে যেমন তার হাত ছাড়াতে যাব অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর কিছুতেই আর ঘুম আসে না। সেই বিদ্‌কুটে স্বপ্নের কথা কোনমতেই আর ভুলতে পারলুম না—সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাথাটা এম্‌নি গরম হয়ে উঠল যে, শেষটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। কাল সাররাত অনিদ্রায় কেটেছে।

কণারকের প্রান্তরে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলুম, সেটাও অনেকটা এই ধরণের। আমার বুক কি-এক বিপদ-ভয়ে গুর্‌গুর্ করে উঠ্‌ল। তবে কি সত্যসত্যই এ মূর্ত্তিটার ভিতরে অস্বাভাবিক কিছু আছে? একটু উত্তেজিত স্বরে বল্‌লুম, "বিনোদ, ও ঘরে আর তুমি শুয়ো না!"

আমার স্বরে চম্‌কে উঠে বিনোদ বল্‌লে, "কেন বল দেখি?"

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললুম, "তুমি ও মূর্ত্তিটার কথা বড় বেশী ভাবছ। হয়ত আজও তুমি ওকে আবার স্বপ্নে দেখবে।"

বিনোদ হাসতে হাসতে বললে, "দেখলুমই বা, তাতে হয়েছে কি!—স্বপ্ন ত সত্য নয়!"

তাকে আমি আর-কখনো হাসতে দেখিনি, সেই হাসিই তার শেষ হাসি!

(ছ)

"তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি—যে রাত্রির কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

সে রাত্রেও আমি টেবিলের সামনে বসে একখানা বই পড়ছিলুম। রাত তখন একটার কাছাকাছি। চারিদিকে স্তব্ধতা যেন থম্‌থম্‌ করছে।

কোথাও কিছু নেই,—হঠাৎ একটা ভারি জিনিষ পড়ার শব্দ হোলো—সঙ্গেসঙ্গে ভয়ানক একটা আর্ত্তনাদ!—সে কী চীৎকার,—চারিদিকের গভীর নীরবতার মধ্যে সে আর্ত্তনাদ যেন আকুল ভাবে ঝাঁপ দিয়ে কোথাও থৈ না পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে অতলে ডুবে গেল!

একলাফে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম।

আমার স্ত্রীও ধড়্‌মড়িয়ে জেগে, বিছানায় উঠে বসে সভয়ে বললে, "ও কী গো, ও কী!"

আবার আর্ত্তনাদ! এবার তত জোরে নয়—কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাভরা! এ যে বিনোদের স্বর!

আমি আর দাঁড়ালুম না, ঝড়ের মত বেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে গেলুম।

বাইরের ঘরের দরজা ঠেলতেই দড়াম্‌ করে খুলে গেল, ভিতরে ঘুট্‌ঘুটে করছে অন্ধকার—মনে হোলো, সে অন্ধকার হাঁ-করে আমাকে গিল্‌তে আস্‌ছে।

শুনলুম, সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে অতি কষ্টে গোঙিয়ে-গোঙিয়ে বিনোদ বলছে, "ছাড়্‌, ছাড়্‌,—ওরে পিশাচী, ছেড়ে দে—ছেড়ে

দে—ছে—" আর কথা বেরুল না,—কেউ যেন তাকে এত জোরে চেপে ধরলে, যে, তার স্বর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

তোমরা বুঝবে না—সে যে কি-এক মহা ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ নেতিয়ে পড়ল! পারলে, তখনি আমি ছুটে পালাতুম—কিন্তু সে শক্তিও আমার ছিল না, ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে-কাঁপতে মাটির উপরে আমি দু-হাতে ভর্ দিয়ে বসে পড়লুম! অন্ধকার ঘরের ভিতরে কেমন-একটা অস্পষ্ট ঝট্‌পটানি শব্দ হোতে লাগল—কেউ যেন কারুর সঙ্গে যোঝাযুঝি করছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুক্তিলাভ করতে পারছে না!... ...ক্রমে ক্রমে সেই ঝট্‌পটানি শব্দটা থেমে এল—তারপর, সব চুপচাপ! আর-একটু তেমন ভাবে থাক্‌লেই আমি নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যেতুম, কিন্তু বাড়ীর যে যেখানে ছিল সবাই জেগে উঠে হৈ-চৈ করতে-করতে সে ঘরে ছুটে এল, আলো দেখে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, নর্ত্তকীর সেই প্রতিমূর্ত্তিটা টেবিলের উপর থেকে মাটিতে উপুড় হয়ে সট্‌ান্ পড়ে আছে, আর তারই তলায়, বিনোদের দেহ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে!

সবাই মিলে ধরাধরি করে, পাথরের সেই ভারি মূর্ত্তিটা বিনোদের উপর থেকে তুলে ফেললুম। বিনোদের বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, সে বেঁচে আছে।

তখনি ডাক্তার ডেকে আনা হোলো।

* * * *

সেই ভারি মূর্ত্তিটার চাপে বিনোদের দেহ আষ্টেপৃষ্ঠে থেঁৎলে গিয়েছিল; অনেক কষ্টে সে প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু তার মাথা

একেবারে খারাপ হয়ে গেল। এখন তার কাছে গেলে সে ক্রমাগত বল্‌তে থাকে, পাষাণীর সঙ্গে প্রেম করে বুক তার পাষাণ হয়ে গেছে।"

(জ)

রমেশ চুপ্ করিল। খানিকক্ষণ শ্রোতারাও কেউ কোন কথা কহিল না।

তারপর যোগেশ আপনার নিবন্ত বিঁড়িতে খুব-একটা জোর-টান মারিয়া বলিল, "সে লক্ষ্মীছাড়া মূর্ত্তিটার কি হোলো ?"

রমেশ বলিল, "তাকে ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলে দিয়েছি।"

সুরেশ বলিল, "সেটা নিশ্চয় ভৌতিক মূর্ত্তি, নইলে—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "না, আমি ভূত মানি না।"

—"তাহলে বিনোদের অমন দশা হোলো কেন ?"

—"মূর্ত্তিটা বোধ হয় কোনগতিকে তার ঘাড়ের উপরে পড়ে গিয়েছিল। এর-মধ্যে ভৌতিক কি আছে ?"

—"তবে সেটাকে ভাঙলে কেন ?"

—"তারই জন্যে আমার বন্ধুর অমন অবস্থা হোলো, সেই রাগে। ... ... কিন্তু মূর্ত্তিটাকে ভাঙবার সময়েও আর এক কাণ্ড ঘটে। চাকররা যখন হাতুড়ি দিয়ে মূর্ত্তিটার উপরে ঘা মারছিল, তখন হঠাৎ তার গা থেকে একখানা ভাঙা পাথর ঠিক্‌রে একটা চাকরের কপালে গিয়ে এমনি জোরে লাগে যে, সে তখনি অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে যায়।"

উমেশ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, "কি ভয়ানক ! তবু তুমি বলতে চাও, এটা ভৌতিক ব্যাপার নয় ?"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, আমি ভূত মানি না।"

অন্ধকার

ক

জমিদার ভুবন-চৌধুরীর পুত্র নগেন সেদিন একটু বেশী রাতে বাড়ী ফিরিল। তাহার মাথার চুল উস্কখুস্ক, জামার বোতামগুলো খোলা, পা-দুটো টলমল, কাপড়-চোপড় এলমেল—পিছনের কাছা বেপরোয়ারূপে অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাম্‌নের কোঁচাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে!

বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জাগিয়া আছে সুধু নূতন ব্রাহ্মণী। গিন্নিমার হুকুম, নগেনকে না-খাওয়াইয়া সে যেন ঘুমাইয়া না পড়ে। তাহার নাম রাইমণি, বয়সটি কাঁচা।

নগেন এখানে-ওখানে ঠোকর খাইতে-খাইতে দালানে আসিয়া, দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল; কোনমতে এড়াইয়া-এড়াইয়া বলিল, "খাবার কোথা?"

খাবারের থালা হাতে-করিয়া রাইমণি আস্তে-আস্তে দালানের ভিতরে ঢুকিল। তাহার মুখে ঘোমটা, ভাব-ভঙ্গী সঙ্কুচিত।

রাইমণি আসা পর্য্যন্ত নগেনের পিপাসী চোখ শিকারীর দৃষ্টির মত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে। কিন্তু রাইমণি এমনি সাবধানী যে, নগেন কিছুতেই তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই! তবে, তাহার সুডৌল গড়ন ও নিটোল হাত দুখানি দেখিয়াই সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল, যে, এত সুশ্রী যার দেহ, তার মুখ কখনই বিশ্রী নহে!

নগেন দাঁড়াইয়া দেখিল, রাইমণি জলছড়া দিয়া খাবারের থালাখানি মেঝের উপর রাখিল ; তারপর আসনখানি বিছাইয়া ও জলের গেলাসটি আগাইয়া দিয়া এককোণে সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন নিঝুম রাতে রাইমণিকে এতটা কাছে নগেন আর-কখনো পায় নাই ! তাহার মনে এর আগে একটু-যে ইতস্তত ছিল, আজ নেশার রঙে সেটুকুও ঢাকিয়া গিয়াছে।

রাইমণির দিকে বাঁকা-চোখে একবার চাহিয়া, নগেন আসনের উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল ; অত্যন্ত উত্তেজনায় তাহার নাকের ডগাটা তখন ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে !

খানদুয়েক লুচি খাইয়া নগেন বলিল, "একটু নুন দিয়ে যাও ত !"

রাইমণি কুন্ঠিতভাবে নগেনের সামনে আসিয়া, হেঁট হইয়া থালায় নুন দিতে গেল।

নগেন দেখিল, পাতলা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর হইতে রাইমণির ডাগর চোখদুটির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে ! এবং সেই সঙ্গে মাথাঘষা মশলার একটা মিশ্র ও মিষ্ট গন্ধ আসিয়া নগেনের মাতাল প্রাণকে পাগল করিয়া তুলিল,—সে আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—হঠাৎ সুমুখদিকে ঝুঁকিয়া এক টান্ মারিয়া রাইমণির মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিল !

"ওগো মাগো !"—বলিয়া রাইমণি বিদ্যুতাহতের মত ঘরের মেঝেতে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। নগেন বলিল, "চুপ, চুপ—চেঁচিও না, সবাই শুনতে পাবে !"

ঠিক পাশের ঘরেই থাকিতেন, গৃহিণী ; সেদিন অসময়ে তাহার

ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। রাইমণির আর্ত্তস্বর তাঁহার কাণে ভেজিল ; তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন।

দেখিলেন, রাইমণি দুহাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপরে পড়িয়া আছে, আর নগেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া থালার সাম্‌নে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে।

তাঁহার এই গুণধর পুত্রটির স্বভাব-চরিত্রের কথা তিনি বেশ ভালোরকমেই জানিতেন, সুতরাং ব্যাপারটা বুঝিতে গৃহিণীর বিলম্ব হইল না। অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে তিনি ডাকিলেন, "নগা !"

নগেন একেবারে কেঁচো ! একটিও কথা না বলিয়া সেখান হইতে সে সুড়সুড় করিয়া উঠিয়া গেল।

গৃহিণী, রাইমণির গায়ে হাত দিয়া আস্তে আস্তে ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "ওঠ মা, ওঠ ! নগার যে এতটা সাহস হবে, আমি তা জানতুম না। জানলে তার সামনে কি তোমাকে একলা বেরুতে দিতুম ?"

খ

সপ্তাহ-খানেক পরে একদিন দুপুরবেলায় রাইমণি, গিন্নীর মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিতেছিল। এই ব্রাহ্মণ-কন্যাটিকে পাইয়া গিন্নী যেন বর্ত্তিয়া গিয়াছেন ; রাইমণি তাঁহাকে মায়ের মত ভক্তি করে, মেয়ের মত যত্ন করে ; রান্নাবান্না ও গেরস্থালীর কাজে সে এতটা নিপুণা, যে তাহার হাতে সংসারের সব ভার সঁপিয়া গিন্নী যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন।

গিন্নী বলিলেন, "বামুন-মেয়ে, কাল মা তোমাকে একটু সকাল সকাল উঠতে হবে।"

রাইমণি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা ?"

—"কাল আমাদের গুরুঠাকুর আসবেন। তাঁর জন্যে আলাদা রান্না সেরে, তবে আমাদের হাঁড়ি চড়্‌বে। সকাল সকাল উনুনে আগুন না-দিলে ওদিকে অনেক বেলা হয়ে যাবে কি না!"

রাইমণি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

খানিক পরে গিন্নী আবার বলিলেন, "হ্যাঁ মা, রোজই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব করব ভাবি, তা পোড়া মন এমনি বেভুল যে, রোজই কেমন ভুলে যাই।"

রাইমণি বলিল, "কি কথা মা ?"

—"শুনেছি, তোমার স্বামী আছেন। কিন্তু এতদিন এখানে রইলে, কৈ, একখানা চিঠি লিখেও তিনি ত তোমার খোঁজ-খপর নিলেন না!"

চুল বাছিতে-বাছিতে রাইমণি হঠাৎ থামিয়া পড়িল—তাহার সরল হাসি-হাসি মুখখানি চকিতে যেন একটা কালো ছায়ায় অন্ধকার হইয়া গেল।

গিন্নী তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না, তাই সহজভাবেই আবার বলিলেন, "চুপ করে রৈলে কেন ? বল না!"

রাইমণি জোর-করিয়া কথা কহিল; বলিল, "জানি না!"

—"এখানকার ঠিকানা তোমার স্বামী জানেন ত ?"

"—না। আমি যে এখানে আছি, তাও তিনি জানেন না।"

গিন্নী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি! তোমার স্বামী জানেন না ?"

রাইমণি যেন ভাঙিয়া পড়িল ; কোন কথা না বলিয়া সে চুপ-করিয়া বসিয়া রহিল।

গিন্নী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বামুন-মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে কি ঝগড়া করে' তুমি এখানে এসেছ ?

রাইমণি কুণ্ঠিতস্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না।"

—"তবে ?"

—"তিনি আমাকে নিতে চান না ?"

গিন্নী যেন আকাশ থেকে পড়িলেন। বলিলেন, "অ্যাঁ! তোমাকে নিতে চায় না ! তোমার এত রূপ, এত গুণ,—তোমাকে নিতে চায় না, কেমন লোক সে ?"

রাইমণি পুতুলের মত বোবা ও স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী যদি পিছন ফিরিয়া না থাকিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, রাইমণির বড়বড় চোখ ধীরে-ধীরে জলে ভরিয়া উঠিতেছে !

গিন্নী আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ কর্ত্তা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন ; তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া, সেখান হইতে পালাইয়া, রাইমণি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল !

গ

রাইমণি কিন্তু বুঝিল, এমন লুকোচুরি আর বেশীদিন চলিবে না, তাহার সব কথা একদিন-না-একদিন বাহির হইয়া পড়িবেই !

তার স্বামী ? হাঁ, তিনি আছেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে থাকিয়াও তিনি আজ বহুদূরে, বহুদূরে! এ ব্যবধান তাহার নিজের পাপে ঘটে নাই—নিষ্ঠুর নিয়তি আজ তাহার জীবন-

দেবতাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে,— তাহার কাকুতি, তাহার অশ্রু, তাহার বেদনা-ব্যাকুলতা এ চিরবিচ্ছেদকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই! আজ তাহার এ দেহ যেন জীবনহীন যন্ত্র-চালিত শবের মত; এ শব কবে কোন্ বাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে বৈতরণীর খরস্রোতে পড়িয়া পরপারে গিয়া ঠেকিবে—ভগবান জানেন—মনে মনে সে এখন সুধু সেই কামনাই করিতেছে। সে জানে, এমন মরিয়া বাঁচিয়া কোন লাভ নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ সীমায় গিয়াও মানুষ যে মন থেকে আশার ছবি মুছিতে পারে না! নিরাশার মরুভূমির মাঝে পথহারা হইয়াও রাইমণি আজও তাই এই মরণভরা জীবনকে কোনক্রমে কায়ক্লেশে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

তাহার স্বামী ছিলেন স্নেহময়, প্রেমময়, সহৃদয়। সেও তাহার স্বামীকে ভালবাসিত সমস্ত জীবন যৌবন ঢালিয়া। স্বামী বিনা আর কারুকে সে চিনিত না, জানিত না। চরিত্রে সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে সেও কিছু খাটো ছিল না; কিন্তু যে-আমাদের ধর্ম্ম সীতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে আকাশে তুলিয়াছে, সেই-আমাদেরই সমাজ তাঁহাকে আবার পাতালে পাঠাইতেও যখন ইতস্ততঃ করে নাই, তখন তুচ্ছ রাইমণির সুখের মেঘে আগুণ লাগিবে না কেন? ……রাইমণির সজল নেত্রের সম্মুখে সমাজের সিংহদ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার বুকফাটা কান্নায় এখন দেবতার আসন টলিলেও, সমাজপতির হৃদয় গলিবে না।

রাইমণি কাঁদিতেছে—কাঁদুক; এমন কত রাইমণির নিষ্ফল অশ্রু সমাজের পায়ে নিয়ত ঝরঝর ঝরিতেছে, কে তার খবর রাখে?

ঘ

ভুবন-চৌধুরীর বাড়ীতে আজ সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অনেকদিন পরে গুরুদেব আজ এখানে পায়ের ধূলা দিয়াছেন।

পুরু পশমের আসনে গুরুদেব তাঁহার নধর-নিটোল দেহটি লইয়া রীতিমত জাঁকিয়া বসিয়াছেন। গুরুর সে গুরুভার হৃষ্টপুষ্ট দেহখানিতে ব্রহ্মচর্য্যের কোন লক্ষণ না থাকিলেও, তাঁহার বোঁটাওয়ালা বেলের মত ন্যাড়া মাথায় দিব্য আধ-হাত টিকি, তেল-চক্‌চকে কপালে ফোঁটা, খ্যাঁদা নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠীর মালা, হাতে হরিনামের ঝুলি ও পরোনে পট্টবস্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বের গুরুতর মাল-মশলার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই।

সকলের আগে বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া গুরুদেবের পা ধরিয়া মাটিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার পরে গৃহিণী, পুত্র ও অন্য-অন্য আত্মীয়-স্বজনের পালা। তারপর, মাথায় একহাত ঘোমটা টানিয়া রাইমণি আসিয়া সলজ্জভাবে প্রণাম করিল।

গুরুদেবের চক্ষুদুটি এতক্ষণ ভাবভরে ঢুলু ঢুলু করিতেছিল; পরের প্রণাম লইয়া-লইয়া তাঁহার শ্রীচরণকমল-দুটি এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিল যে, এতগুলো কৃষ্ণের জীব আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া এত যে টানাটানি করিয়া গেল, সেদিকে তাঁহার কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না; কিন্তু, ঘোমটার ভিতর হইতে রাইমণির মুখ দেখিবামাত্র তাঁহার ঘুমন্ত দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিল।

তাকিয়া ছাড়িয়া, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া, কর্ত্তার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ভুবন, এ মেয়েটি কে?"

কৰ্ত্তা বলিলেন, "এ মেয়েটি আমার বাড়ীতে রাঁধে।"

—"কৈ, গ্যালবারে যখন এসেছিলুম, তখন ত মেয়েটিকে দেখি-নি!"

—"ও.সবে মাসতিনেক এখানে আছে।"

—"মাস তি-নে-ক! তবে কি"—বলিতে বলিতে থামিয়া পড়িয়া, গুরুদেব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রাইমণির দিকে চাহিলেন।

রাইমণি তখন অত্যন্ত জড়োসড়ো হইয়া আস্তেআস্তে চলিয়া যাইতেছিল—গুরুদেবকে দেখিয়া সেও যেন কেমন থতমত খাইয়া গিয়াছিল।

খানিক স্তব্ধ থাকিয়া গুরুদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির নাম কি?"

—"রাইমণি!"

—"রাইমণি! ও কি তড়া-আঁটপুর গাঁ থেকে এসেছে?"

গিন্নী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকুর, আপনি জানলেন কি ক'রে?"

সে কথার কোন জবাব না-দিয়া, গুরুদেব হতাশভাবে তাকিয়ার উপরে আড় হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভুবন, এখানে আর আমার দেবতার ভোগ হোতে পারে না—তোমার জাত গিয়েছে!"

গাঁয়ের সমাজপতি ভুবন-চৌধুরী,—যিনি কত লোককে একঘরে করিয়া 'পত্-পত্ রবে' হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছেন, যাঁহার ভয়ে ছেলে-ছোক্‌রার দল চোরের মত আটঘাট না বাঁধিয়া শ্রী-শ্রী রামপক্ষীর বিখ্যাত শ্রী-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না, যাঁহার একটু ইঙ্গিতেই ধোপা-নাপিতের অভাবে অনেক অভাগার কাপড়

হইয়াছে কয়লার মত ময়লা এবং দাড়ী-গোঁফ হইয়াছে যাত্রা-থিয়েটারের মুনি-ঋষিদের মত নাভিচুম্বনোদ্যত,—তাঁহারই এত যত্নে বাঁচানো পৈতৃক জাতিটি থাম্‌কা মারা গিয়াছে? গুরুদেব বলেন কি! 'মেঘনাদ-বধে'র রাবণ যখন ভগ্নদূতের মুখে "নিশার স্বপনসম বারতা' শুনিয়াছিলেন, তখন তিনিও বোধকরি আমাদের ভুবন-চৌধুরীর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইবার সুযোগ পান নাই! কর্ত্তা বসিয়াছিলেন, লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "প্রভু, এ কি নিদারুণ কথা! আমার জাত্ গিয়েছে? অ্যাঁ! অ্যাঁ!"

—"হ্যাঁ, তোমার জাত্ গিয়েছে! এতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

—"রাইমণি কি বামুনের মেয়ে নয়?"

—"হ্যাঁ, সে বামুনের মেয়ে।"

ভুবন-চৌধুরী ভুরু কুঁচকাইয়া খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "তবে কি ও কুলত্যাগ করেছে?"

—"না।"

তাইত! ভুবন-চৌধুরী অতিশয় ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়িয়া গেলেন! তিনি জানিলেন না শুনিলেন না—অথচ তাঁহার এত সাধের জাতিটি কোন্ ফাঁকে স্রেফ্ কর্পূরের মত উবিয়া গেল! অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষটা তিনি হাল ছাড়িয়া হতাশভাবে বলিলেন, "তবে?"

হরিনামের ঝুলির ভিতরে ঘন-ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে-করিতে গুরুদেব বলিলেন, "শোন বলি। রাইমণির স্বামী আমারই শিষ্য। ওর স্বভাব-চরিত্র খুব ভালো—কারুর দিকে উঁচুনজরে

চাইতে ওকে কেউ দেখে-নি। কিন্তু গত-জন্মে ও কি পাপ করেছিল জানি না, এ জন্মে তাই বুঝি তারই শাস্তিভোগ করছে। হরি হে, তোমারি কৃপা!"

ভুবন চৌধুরী গুরুদেবের এ গোলক-ধাঁধার ভিতরে কিছুতেই ঢুকিতে পারিলেন না, সুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে হাঁ-করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গুরুদেব আবার বলিলেন, "মাস-চারেক হোলো, একদিন রাত্রে রাইমণিদের বাড়ীতে হঠাৎ ডাকাত পড়ে। ডাকাতরা যাবার সময়ে রাইমণিকেও ধরে নিয়ে যায়। গাঁয়ের লোকেরা তার চীৎকার আর কান্না শুনেও ডাকাতের ভয়ে কোন উপায়ই করতে পারলে না। পরে পুলিস এসে রাইমণিকে খুঁজে বার করলে। গ্রামের বাইরে একটা জঙ্গলের ভিতরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল।"

সকলে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল, কাহারও মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভুবন-চৌধুরীর দিকে চাহিয়া গুরুদেব আবার বলিতে লাগিলেন, "পুলিস-তদারকের পর জনকতক ডাকাত ধরা পড়ল— তাদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। কিন্তু ডাকাত ধরা পড়লে কি হবে—তাদের সংস্পর্শে রাইমণি যে অমূল্য রত্ন হারাল, সে ত আর ফিরে পাবার নয়! স্বামীর পা ধরে সে অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক কান্নাকাটি করলে; বললে সে নিষ্পাপ। ভগবান জানেন, সে কথা সত্য কি মিথ্যা! কিন্তু মানুষের মনের সন্দেহ ত চাপা দেওয়া যায় না। এর জন্যে সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ওর স্বামীও ওকে আর ঘরে ঠাঁই দিতে পারলে না।"

ভুবন-চৌধুরী বিহ্বলভাবে গুরুদেবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ও মাগী নিজের জাত-খুইয়ে কুল-মজিয়ে শেষটা কিনা আমাকে মজাতে এল! আমার কি উপায় হবে প্রভু, আমার কি উপায় হবে ?"

গুরুদেব বলিলেন, "ওকে কি তুমি জানতে না ?"

—"জানলে কি ওকে ঘরে ঠাঁই দিতুম—ধুলোপায়েই বিদেয় করতুম! যত নষ্টের গোড়া ঐ নাপ্তিনী-মাগী, সেইই ত জেনে-শুনে ওকে আমার ঘাড়ে গছিয়ে গেছে। ছি, ছি, এ কথা প্রচার হোলে সমাজে আর মুখ দেখাব কেমন করে' ?"

গুরুদেব তাঁহার গ্যাস-ভরা বেলুনের মত ফোলা, মোটাসোটা ভুঁড়িটির উপরে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই। এ তোমার অজ্ঞানকৃত পাপ। তবে, প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আর রাইমণিকেও এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।"

৬

ঘরের মেঝেতে রাইমণি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে,—তাহার দুইগাল দিয়া ঝর ঝর অশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ কে তার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিল; চমকিয়া, মুখ তুলিয়া সে দেখিল, ঠিক তার সামনেই নগেন—সন্ধ্যার তরল আঁধারে তাহার চোখদুটো গিরগিটির চোখের মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! ভয়ে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাইমণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

নগেন চাপা-গলায় বলিল, "চেঁচিও না—চেঁচিও না! আমি যা বলতে এসেছি, শোন।"

ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া, রাইমণি থর্‌থর্ করিয়া কাঁপতে লাগিল।

নগেন বলিল, "দেখ, সমাজে কেউ তোমাকে ঠাঁই দেবে না—যেখানে যাবে সেখান থেকেই তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সমাজ তোমাকে না-চাইলেও আমি তোমাকে ফেলতে পারব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, আমি তোমাকে রাজরাণীর মত রাখব—তোমার কোন অভাব থাকবে না। তোমার ধর্ম্ম ত গিয়েছেই, তবে তুমিই-বা কেন ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধরে মিছে পরের লাঞ্ছনা সহ্য করবে?"

রাইমণি যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, হ্যাঁ না কিছুই বলিল না।

নগেন বুঝিল, মৌনই সম্মতির লক্ষণ। সে আস্তে-আস্তে বলিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি রাইমণি! এত ভালোবাসি, যে বলবার নয়। আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব। আজ শেষরাতে খিড়কীর দরজায় আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব,—তোমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে। তুমি কিছু ভেব না, তুমি যা চাইবে তাই পাবে—বাড়ী-ঘর, কাপড়-গয়না, দাসী-বাঁদি! জান ত, টাকা আমার হাতের ধূলো।"

হঠাৎ বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। নগেন ব্যস্তভাবে বলিল, "ঐ কে আসছে—আমি চল্লুম। মনে রেখ—শেষরাতে খিড়কীর দরজায়।"—বলিয়াই, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রাইমণি সেখানেই বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল... ...সেদিন সে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ আর জ্বলিল না।

৮

নিঝুম রাত্রি। আকাশ জুড়িয়া দুধের ধারার মত জ্যোৎস্নার রূপের ঢেউ চল্‌কাইয়া উঠিয়াছে, ভাঙামেঘের ধারে ধারে চাঁদের হাসি আলোক-পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চৌধুরী-বাড়ীর দরজা খুলিয়া এই নীরব নিশীথে এক রমণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কোনদিকে না চাহিয়া ধীরে-ধীরে একাকিনী চলিতে লাগিল।

ঘুমের কোলে শুইয়া গ্রামখানি নিসাড় হইয়া আছে। তাহারি মাঝখান দিয়া নানা পদচিহ্ন-লেখা আঁকাবাঁকা পথের রেখাটি স্বপ্নের ছবির মত চলিয়া গিয়াছে,—কখনো আলোকে জাগিয়া, কখনো ছায়ায় মিলাইয়া।

রমণী সেই পথ ধরিয়া চলিল—চন্দ্রালোকে সেই শুভ্রবসনা রহস্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া গেঁয়ো কুকুরগুলো ভয় পাইয়া পথ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

মাঠের ধারে পথের শেষ।—রমণী কিন্তু থামিল না, সেই ধূধূ মাঠের ভিতর দিয়াই সে স্বপ্নাবিষ্ট অন্ধের মত সমানে অগ্রসর হইতে লাগিল;—দূরে জলাভূমিতে ভৌতিক ব্যাপারের মত আলেয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; আরো-দূরে শ্মশানের চিতার মত কি একটা আগুন দাউদাউ জ্বলিতেছে;—তার কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, সে যেন মরণকে একটুও ডরায় না!

চাঁদ যখন পাণ্ডুমুখে পশ্চিমে নামিতেছে, মাঠ তখন শেষ হইল। সামনেই গভীর অরণ্য, তার মধ্যে পথ নাই আলো নাই শব্দ নাই; সুধু কষ্টিপাথরের চেয়েও কালো, একটা বিরাট নিস্পন্দ জমাট

অন্ধকার, এক অনন্তদেহ পিশাচের মত বিশ্বকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন হাঁ-করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে!

হঠাৎ কোন্ দূর কুঞ্জবনে পাপিয়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চারিদিকের থম্‌থমে স্তব্ধতার মধ্যে পাপিয়ার আকস্মিক গান শুনিয়া রমণীও থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; এতবড় দীর্ঘপথে এই প্রথম সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, চাঁদের অন্তিমহাসি প্রান্তরের শ্যামলতার উপরে তখনো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ... ...বিদায়ের মলিন হাসি! ... ...

রমণীর বুক ঠেলিয়া একটি চাপা নিশ্বাস উঠিল—সে যেন চুপেচুপে অস্ফুট হাহাকার!... ... ...

তারপর, সেই চাঁদের আলো, পাপিয়ার গান পিছনে রাখিয়া, রমণী সুমুখপানে অগ্রসর হইল;—চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া বিপুল অন্ধকার তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে... ... ...মৃত্যুর মত!

•

উন্‌পাঁজুরে

আমার বয়স কত জানো?... ... আটবছর! কিন্তু বয়স শুনেই তোমরা যেন মুখ বেঁকিয়ে বোসো না—কারণ, আমি কমবয়সেই ভারি চালাক ছেলে! লোকে তাই বলে, আমি নাকি এঁচড়ে-পাকা!

কিন্তু চালাক ছেলেদেরও যে ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করে' মর্‌তে হয়, এ দুঃখু আমার রাখ্‌বার ঠাঁই নেই। লেখাপড়ার সময়ে আমার চালাকি একেবারেই খাটে না। এই ত্থাখনা কেন, কাল সকালবেলায় একটু ফুর্ত্তি করে' লাট্টুতে সবে লেত্তিটি জড়াতে সুরু করেচি, আর অমনি কিনা ধাঁ-করে' দাদা এসে আমার কাণ মলে লাট্টু কেড়ে নিলে! আচ্ছা বাবা, আমারও দিন আস্‌বে; দাঁড়াও না, আগে আর-একটু বড়সড় হই, তখন দাদার দাদাগিরি ফলানো বার করে' দেব! ... বড় হয়ে আমি দিন-রাত খালি মার্ব্বেল খেল্‌ব, লাট্টু ঘোরাব আর ঘুঁড়ি ওড়াব! মা, বাবা, দাদা কারুর কথা শুন্‌ব না—বক্‌লে-টক্‌লে বল্‌ব, আমি এখন বড় হয়েচি, বুড়ো-মিন্‌সের আবার পড়াশুনো কি!

বড় হয়ে কিন্তু আর-একটা কাজ কর্‌তেই হবে! আমাদের ছিদামের মত একটা মণিহারীর দোকান না-কর্‌লে ত কিছুতেই চল্‌বে না! ছিদামটা হচ্ছে পাজীর পা-ঝাড়া—তার কাছে কিছু

কিন্‌তে গেলেই হতভাগাটা পয়সা চেয়ে বসে! এটুকু বুদ্ধি তার মাথায় নেই যে, আমি হলুম গিয়ে ছেলেমানুষ, পয়সা-টয়সা কোথায় পাব! হ্যাঁ, বড় হয়ে আমাকে একটা মণিহারীর দোকান করতে হবেই-হবে! তাতে টিনের বাঁশী, ভেঁপু, মস্তমস্ত কাঠের ঘোঁড়া, হাজার হাজার রাঙা-টুক্‌টুকে লাঠি, বস্তাবস্তা লজঞ্চুস্, ব্যাটবল, ফুটবল এই-সব থাক্‌বে। আমার যখন যেটা খুসি হবে সেইটেই নেব, ছিদাম দাম চাইতে এলে মারব ব্যাটাকে এক থাবড়া—চোখ রাঙিয়ে বল্‌ব, আমার দোকান, আমি নিচ্চি, তুই পয়সা চাইবার কে রে ইষ্টুপিড? ছিদাম তখন আচ্ছা জব্দ হয়ে মুখখানি চুণ করে' চলে যাবে—ওহো, কি মজা!

এই-সব ভাবচি, এমনসময় দাদা এসে চোখ পাকিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ রে হরে, বাঁদরের মত হাঁ-করে' বসে-বসে কড়িকাঠ গোণা হচ্চে বুঝি?"

দাদার দিকে আমি রেগে-মেগে কট্‌মট্ করে' তাকালুম।

দাদা সাম্‌নের চেয়ারখানা জান্‌লার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে বল্‌লে, "হনুমানের মত আবার চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌চিস্ কি? দেব এক্ষুনি চোখে প্যাট্ করে' ছুঁচ্ বিঁধিয়ে! নে, নে, চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ কর!"

এঃ! দাদাটা জ্বালালে দেখচি! একটুখানি যে থির হয়ে বসে থাক্‌ব, তারও যোটি নেই! খালি পড়্, পড়্, পড়! কেন, প'ড়ে কি আমার চারটে হাত বেরুবে?

কি আর করি, মার খাবার ভয়ে সুড়্-সুড়্ করে' টেবিলের

কাছে গিয়ে চাণক্যশ্লোক পড়্‌তে বস্‌লুম। এক জায়গায় লেখা রয়েছে—

"অতএব কিবা পুত্র কিবা ছাত্রগণে
না দিবে আদর সদা রাখিবে শাসনে।"

দাদা মস্ত মুরুব্বির মত মাথা নেড়ে পা নাচাতে-নাচাতে বল্‌লে, "শুন্‌চিস্‌ ত হরে, চাণক্যের মত অত-বড় পণ্ডিত কি বল্‌চেন! এই সব বুঝে-সুঝে ঠাণ্ডা হয়ে পড়াশুনো কর—নৈলে তোর পিঠের ছাল-চাম্‌ড়া আর আস্ত থাক্‌বে না! শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌!"—এই বলে দাদা পাখার বাঁট্‌টা দিয়ে ঠকাং করে' আমার পিঠের ওপরে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

মার খেয়ে-খেয়ে আমার পিঠখানা গরুর গাড়ীর গরুর মত এম্‌নি শক্ত হয়ে গেছে যে, পাখার বাঁটের অমন এক-আধ ঘায়ে আমার কিছু আসে-যায় না! ...... কিন্তু এই চাণক্য লোকটা কে? তার ওপরে আমার এম্‌নি রাগ হচ্চে! আমি যখন বড় হব, আমার গায়ে যখন জমিদার-বাবুদের দরোয়ান রঘুবীর পাঁড়ের মত খুব জোর হবে, তখন যদি এই চাণক্য পণ্ডিতের একবার দেখাটি পাই, তাহলে আর ছেড়ে কথাটি কইব না—একেবারে তার মাথা থেকে টিকিটি ধরে, পটাস্‌ করে' উপড়ে নেব!

দাদা আমার দিকে পিছন ফিরে বসে গুন্‌গুন্‌ করে একটা গান গাইছিল, তার মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না—কিন্তু কথাগুলোর কতক-কতক মনে আছে—

"রয়ে রয়ে কেন তার মুখ মনে পড়ে,
ও মেঘেরি বারি বিনে চাতকিনী প্রাণে মরে।
... ...
এই লও তীক্ষ্ণ ছুরি, হান মম বক্ষোপরে,
নিভে যাক্ আঁখিতারা হেরিতে হেরিতে তোরে!"

—মাথা নাড়তে নাড়তে টেবিল বাজিয়ে দাদা গান গাইতে লাগ্‌ল, আমিও জিভ্ বার করে' তাকে ভ্যাংচাতে লাগ্‌লুম! দাদা আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিল না, কাজেই কিছু বুঝ্‌তেও পারলে না। কেমন জব্দ! .

হঠাৎ দাদা ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর আমার দিকে ফিরে বল্‌লে, "হরে, তুই এইবার কথামালা পড়্—আমি ততক্ষণ বাইরে থেকে একবার চট্ করে' ঘুরে আসি।"

লক্ষ্মীছেলের মত ঘাড় গুঁজে আমি 'কথামালা' পড়্‌তে লাগলুম। "এক সিংহ, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; সুতরাং তাহার আহার বন্ধ হইয়া আসিল। * * * * এক শৃগাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল। * * * * সিংহ, শৃগালকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কেও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল। আইস ভাই আইস; আমি ভাবিতেছিলাম—"

দাদা তাড়াতাড়ি চলে গেল—আমারও অমনি বামুন গেল ঘর ত লাঙল তুলে ধর্! বইখানা ছুঁড়ে একদিকে ফেলে দিয়ে ভাবতে লাগলুম, দাদাটা গেল কোথায়? এই ঠিক দুপুরবেলা,

রোদ করচে ঝাঁ-ঝাঁ, এটা ত আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাবুর মত বেড়াবার সময় নয়! অথচ দেখ্‌ছি দাদা বাঁশবাগানটা ঘুরে ডানদিকের পথ ধরে কোথায় চলে গেল! ... ... ভাবতে-ভাবতে দাদার মৎলবটা ঠিক এঁচে ফেল্‌লুম—আমি কম-বয়সেই খুব চালাক ছেলে কিনা! হুঁঃ, এ আর কিছু নয়, মুকুয্যেদের বাগানে বড়-বড় বাতাবি লেবু হয়েছে, দাদা নিশ্চয় সেই লেবু চুরি করবার ফিকিরে আছে! ঐ লেবুগুলোর ওপরে আমারও খুব নজর ছিল; কাজে-কাজেই আমি যে হাঁদা-গঙ্গারামের মত বসে-বসে পড়া মুখস্থ করে' মরব, আর দাদা বেড়ে মজা করে' লেবু পেড়ে-পেড়ে খাবে, তা কিছুতেই হ'তে পারে না! আমাকেও দেখ্‌তে হ'ল—দু'-একটা নেবুতে যদি আড়াল থেকে ছোঁ লাগাতে পারি!

চট্‌পট্‌ উঠে পড়ে তখনি দাদার পেছু নেওয়া গেল। বাঁশ-বাগানের মোড় ফির্‌তেই পুকুরের ধারে, একটা পেয়রা-গাছের তলায় দাদাকে দেখ্‌তে পেলুম। সুধু দাদা নয়—তার সাম্‌নেই পট্‌লি-দিদিও চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে!

পট্‌লি-দিদি আমাদের গাঁয়ের যদুজ্যাঠা-মশায়ের মেয়ে! ওরা আমাদেরই জাত্‌—ওদের বাড়ীতে আমরা খুব যাওয়া-আসা করি বলে পট্‌লি-দিদির বাপকে আমি জ্যাঠামশাই বলে ডাকি। শুনেছি পট্‌লি-দিদির সঙ্গে আমার দাদার বিয়ের সমন্দ হচ্চে।

কিন্তু পট্‌লি-দিদি অমন চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে কেন? দূর থেকেই দেখ্‌তে পেলুম, দাদা কি যেন বলচে, আর পট্‌লি-দিদি তাই শুনে মাথা হেঁট্‌ করে' ফিরে দাঁড়াচ্চে। ও, বুঝেচি,

পটুলি-দিদি নিশ্চয় আমাদের গাছ থেকে পেয়রা চুরি করে' খাচ্ছিল, আর তাই দেখতে পেয়েই দাদা তাকে ধম্‌কাচ্ছে! ঐ যে, পটুলি-দিদির হাতেও আধখানা পেয়রা রয়েছে!

একটা কৃষ্ণকলির ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে বসে, আমি তাদের রকম-সকম দেখতে লাগ্‌লুম। পাছে দাদা আমাকে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে আমি মাথাটা নীচু করে' বসে রইলুম।

খানিক পরেই দেখি, দাদা ভয়ে-ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখ্‌লে—তারপর কর্‌লে কিনা—আস্তে আস্তে পটুলি-দিদির হাত না ধরে টপ্‌ করে' তার মুখে একটা চুমু খেয়ে নিলে! পটুলি-দিদি অম্‌নি দাদার হাত না ছাড়িয়ে, নিজেদের বাড়ীর দিকে দে-ছুট্‌ ত দে-ছুট্‌!

ও হরি, চুমু খাওয়া? কম-বয়সেই আমি বেজায় চালাক কিনা,—কাজেই মেয়েমানুষের মুখে ব্যাটাছেলের চুমু খাওয়া যে ভারি খারাপ, সেটা জান্‌তে আমার বাকি ছিল না! দাঁড়াও দাদা, মজাটা টের পাওয়াচ্চি—ভারি যে আমাকে মার্‌-ধর্‌ করা হয়, এবার কে আমাকে মারে একবার দেখে নেব!

দাদা আবার বাড়ীর দিকে আস্‌তে লাগল—আমিও লুকিয়ে-লুকিয়ে উঠে, সেখান থেকে একছুটে একদম বাড়ীতে এসে হাজির! দাদাকে আজ আমার হাতে মুঠোর ভেতরে পেয়েচি বলে প্রাণটা যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি 'কথামালা'-খানা টেনে নিয়ে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে 'সর্প ও কৃষকে'র গল্পের একটা জায়গা পড়্‌তে লাগলুম:—"কৃষক দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পকে বলিল, অরে ক্রুর, তুই

অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া, গৃহে আনিয়া, আমি তোর প্রাণরক্ষা করিলাম; তুই সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে দংশন করিতে উদ্যত হইলি।—"

দাদা আস্তে-আস্তে ঘরে এসে ঢুক্‌ল। আমি আড়্-চোখে চেয়ে দেখলুম, দাদা ভারি হাঁপাচ্চে! একবার আমার দিকে তাকিয়ে দাদা আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল। আমিও অম্‌নি বইখানা মুড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

দাদা বল্‌লে, "কিরে, উঠ্‌লি যে?"

আমি দরজার দিকে এগুতে-এগুতে বল্‌লুম, "পড়্‌তে আর ভালো লাগচে না!"

—"কী! পড়্‌তে তোর ভালো লাগ্‌চে না?"

আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লুম, "নাঃ!"

—"আবার 'না'! নবাব-বাহাদুর হয়েচিস্ দেখ্‌চি যে! ঘুসি মেরে দাঁত ভেঙে দেব, জানিস্?"

আমিও রেগে-মেগে বল্‌লুম, "ওঃ, ঘুসি অম্‌নি মার্‌লেই হ'ল কিনা! দাঁড়াও-না, আগে মাকে গিয়ে সব বলে দিয়ে আসি, তার-পর তুমি ঘুসি খাও কি আমি ঘুসি খাই ভাখা যাবে!"

দাদা মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এসে বল্‌লে, "মাকে গিয়ে বল্‌বি? আমাকে আবার ভয় ভাখানো হচ্চে?"—বলেই আমার একটা কাণ টেনে ধর্‌লে।

—"কাণ ছাড়ো বল্‌চি দাদা, নইলে মার কাছে গিয়ে এখনি বলে দেব যে দাদা পেয়ারাগাছের তলায় গিয়ে—"

আমার মুখের কথা মুখেই রইল—সব কথা শোনবার আগেই

দাদা চম্‌কে আমার কাণ ছেড়ে দিলে,—তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল !

আমি আজ দাদার সাম্‌নে এই প্রথম বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ফিক্‌-ফিক্‌ করে' হাসতে লাগ্‌লুম।

দাদার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথাই বেরুল না। অনেকক্ষণ পরে খুব চুপিচুপি দাদা বল্‌লে, "হরি, কি বল্‌ছিলি ভাই ?"

—"কী আবার বল্‌ছিলুম! পটলিদিদিকে চুমু খাওয়ার কথা বল্‌ছিলুম ! এখন—"

তাড়াতাড়ি দু-হাতে আমার মুখ চেপে ধরে দাদা বলে উঠ্‌ল, "চুপ্‌, চুপ্‌! অত চ্যাঁচাস নে ভাই, সবাই শুন্‌তে পাবে যে !"

—"কেন, তুমি যে বড্ড মার্‌বে বল্‌ছিলে! এখন মারো-না দেখি !"

—"সে কি ভাই, আমি কি তোকে সত্যি-সত্যিই আর মারতুম হরি, আমি যে ঠাট্টা কর্‌ছিলুম !"

—"তোমার ও-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, আর ও-রকম ঠাট্টা কর্‌ব না! কিন্তু তুই ভাই মাকে আর বাবাকে কি আর-কারুকে কিছু বলিস্‌-নে যেন! লক্ষ্মী মাণিক আমার !"

—"বেশ, তা যেন বল্‌ব না! কিন্তু তুমি আমাকে কি দেবে বল ?"

—"কি নিবি বল্‌! টাকা নিবি, টাকা ? নিবি ? এই নে! যা, খেল্‌না কিন্‌-গে যা—আমি আর তোকে বক্‌ব না !"

ছোঁ-মেরে দাদার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আমি আগে

একটা ডিগবাজি খেয়ে নিলুম। তারপর উঠেই তখনি ছিদামের দোকানে দৌড়লুম। মস্ত একটা বোমালাটাই, ক' কাটিম কাকের ডিমে মাঞ্জা-দেওয়া সুতো আর অনেকগুলো দো-রঙলা ঘুড়ি— টাকা দিয়ে আজ এই-সব কিনতে হবে!

... ...

তারপর থেকে দাদার কাছ থেকে প্রায়ই টাকাটা সিকিটা আদায় করতুম। আমি হাত পাত্‌লে দাদা আর না- বল্‌তে ভরসা পেত না! বাবা আমাকে দাদার হাতে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্তি, এদিকে দাদা যে আমার হাতের মুঠোয়, সে খোঁজ কেউ পেলে না! পড়াশুনোও আমাকে আর বেশী করতে হয় না—যখন-খুসি পড়্‌তে বসি, যখন-খুসি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই, ঘুঁড়ি ওড়াই, লাট্টু ঘোরাই আর মনের সুখে ডিগ্‌বাজি খাই! দাদা-বেচারী জুল্‌-জুল করে' আমার দিকে তাকিয়ে গুম্ হয়ে বসে থাকত— মনে-মনে সে যে আমার ওপরে ভয়ানক চটে আছে, বাগে পেলে সে যে আমার মুণ্ডুটা এক্ষুনি কড়্‌মড়িয়ে চিবিয়ে খায়, এ আমি তার মুখ দেখে বেশ বুঝ্‌তে পারি!

এদিকে সেই কথাটা মা-বাবাকে বলে দেবার জন্যে আমার মুখ যেন নিস্‌পিস্ করতে থাকত! কিন্তু আমারও কিছু বল্‌বার যো নেই, কারণ এখন যদি আমি পেটের কথা ফাঁস্ করে' ফেলি, তাহলে আর কি আমার রক্ষে আছে? সব জানাজানি হয়ে গেলে, দাদার ভয় একবার ভেঙে গেলে, আমাকে বিষম মুস্কিলে পড়্‌তে হবে! আমি কম-বয়সেই ভারি চালাক ছেলে কিনা, কাজেই এটুকু বুঝ্‌তে আমার একটুও দেরি লাগ্‌ল না।

তবু একদিন প্রায় বলে ফেলেছিলুম আর কি! সেদিন দাদা, আমি আর বাবা একসঙ্গে খেতে বসেচি, মা পরিবেশন কর্‌চেন।

হঠাৎ আমার মাথায় কি খেয়াল ঢুক্‌ল, আমি বলে ফেল্‌লুম, "মা, পেয়ারা-গাছের তলায় সেদিন কী মজাটাই হয়েচে!"

মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি হয়েচে রে?"

—"পট্‌লি-দিদিকে দাদা—"বল্‌তে-বল্‌তে আমি থেমে গেলুম, দাদার মুখ তখন ভয়ে আর রাগে কেমন একরকম হয়ে উঠ্‌ল।

মা বল্‌লেন, "থাম্‌লি ক্যান্‌ রে হরে, কি বল্‌ছিলি বল্‌না!"

কম-বয়সেই আমি খুব চালাক বলে, ধাঁ-করে' কথাটা ঘুরিয়ে নিলুম।:—"পট্‌লিদিদি আমাদের গাছ থেকে পেয়রা চুরি করে' খাচ্ছিল, দাদা তাকে ধরে ফেলেচে!"

মা হাস্‌লেন, বাবা হাস্‌লেন, দাদা নিশ্বেস ফেলে বাঁচ্‌ল।

... ...

এরি-মধ্যে একদিন দাদার সঙ্গে পট্‌লিদিদির খুব ঘটা করে' বিয়ে হয়ে গেল। ...

বিয়ের দিন-পাঁচেক পরে, দাদা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়চে, আমি গিয়ে বল্‌লুম, "আমাকে গোটা-দুয়েক টাকা দিতে হবে দাদা!"

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে দাদা খিঁচিয়ে উঠে বল্‌লে, "টাকা গাছের ফল পেয়েচিস্‌, না? বেরো এখান থেকে!"

অনেকদিন পরে দাদা ফের আমার সঙ্গে চড়া গলায় কথা কইলে! আমিও গরম হয়ে বল্‌লুম, "আমি পায়রা কিনব, টাকা দেবে ত দাও বল্‌চি!"

দাদা খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "তুই কি ভেবেচিস্ বল্ দেখি হরে? আমাকে তোর কেনা গোলাম পেয়েচিস্ নাকি শুয়োর?"

দাদার জোর-জোর কথা শুনে আমার হাড় যেন জ্বলে গেল! আমিও তেরিয়া হয়ে বল্লুম, "টাকা দেবে না তাহলে?"

—"তবে রে রাস্কেল! খালি খালি শাসানো?"—এই বলেই দাদা দুম্ ক'রে, আমার পিটে এক বোম্বাই কিল বসিয়ে দিল!

কিল খেলে যে-রকম করে' চ্যাঁচাতে হয় তেম্‌নি করে'ই চেঁচিয়ে আমি বলে উঠ্‌লুম, "কী! আবার কিল মারা? আমি এই চল্লুম মার কাছে সেই কথাটা বল্‌তে!"

—"যা, বল্-গে যা উল্লুক, বল্‌গে যা, তোকে আমি আর থোড়াই কেয়ার করি!"—বল্‌তে-বল্‌তে দাদা আমার পিঠের ওপরে দু-হাতে ক্রমাগত ঘুসি আর চড় মার্‌তে লাগল।

আমি রাগের আর মারের জ্বালায় অস্থির হয়ে, একছুটে মার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লুম! মা আর বাবা দুজনে বসে কি কথা কইছিলেন, আমি চেঁচিয়ে ঘর ফাটিয়ে বল্লুম, "মা, মা, দাদা আমাকে মেরেচে!"

—"কেন, কি দুষ্টুমি করেছিলি?"

—"কিছু না মা! দাদা পটলি-দিদিকে চুমু খেয়েছিল, সেই কথা আমি তোমাদের বলে দেব বল্লাতে দাদা আমাকে—"

বাবার দিকে তাকিয়ে মা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন, "থাম্ হতভাগা, থাম্,—ও-সব কথায় তোর দরকার কি? এমন উন্‌পাঁজুরে ছেলেও ত কোথাও দেখি-নি বাপু!"

বাবা আমার কাণ মলে দিয়ে বল্লেন, "পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার! এখন থেকেই এঁচড়ে পেকে উঠ্‌চ? দূর হ, দূর হ!"

হতভম্ব হয়ে সেখান থেকে চলে এলুম।......

অনেক ভাবলুম। কিন্তু কম-বয়সে আমি এত-বেশী চালাক হয়েও, এটা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলুম না যে, দাদার ভয়টা হঠাৎ ভেঙে গেলই-বা কেন, আর চুমু-খাওয়ার কথা শুনে মা বাবা উল্টে আমাকেই-বা ধমক দিলেন কেন?.........আচ্ছা, আচ্ছা, এখন না-পারি দুদিন পরেই সব সমঝে নেব—এ-সব কথা হয়ত বড় না-হ'লে বোঝা যায় না!

তরুণা

তাদের পরস্পরের প্রথম-পরিচয় হয়—ঘরেও নয় পথেও নয়, একেবারে গহন বনে! জায়গাটি খুব চমৎকার না-হইলেও, তাহাদের আলাপটি প্রথমদিনেই জমিয়া উঠিয়াছিল খুবই চমৎকার!

—অতএব, দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ দিনের কথা রাখিয়া, সেই প্রথমদিনের কথাটাই সবপ্রথমে বলিয়া লইতে চাই।...

গোমো-জংসনে হাওয়া বদ্‌লাইতে আসিয়া, প্রকৃতির রূপ দেখিয়া বসন্ত একেবারে মোহিত হইয়া গেল। তুমি-আমি প্রকৃতিকে যে চোখে দেখি, বসন্ত ঠিক সে চোখে দেখিল না; কারণ, সে ছিল চিত্রকর—প্রকৃতিকে দেখিল সে শিল্পীর চোখে!

তার পরদিনেই সে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একটি মনের মত জায়গা বাছিয়া 'চিত্রাধার'টিকে দাঁড় করাইল। তারপর পটের উপরে প্রকৃতিকে আকৃতি দিবার চেষ্টায় একমনে লাগিয়া গেল।

এম্‌নি করিয়া প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তার ছবি-আঁকা কাজ চলিতে লাগিল।

খ

বসন্তের ছবি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর দু-একদিনেই তুলির কয়েকটি শেষ-স্পর্শে চিত্রখানি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

পশ্চিমের নীলসায়রে রবি-করের রঙিন ঢেউ তখন ক্রমেই

মিলাইয়া আসিতেছে; দূরে আকাশভেদী 'পরেশনাথে'র শিখর শিখরে খানকয় ছোটছোট মেঘ পতাকার মত থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, বসন্ত অনিমেষে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভাবিতেছিল, চিত্রকরের হাতে যদি এমন যাদু থাকিত, যাতে-করিয়া ছবির মেঘও ঠিক অমনি ভাবেই কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিত, তাহা হইলে—

তাহা হইলে কি হইত সেটা ঠিকমত বুঝিতে-না-বুঝিতে পিছন হইতে হঠাৎ কামিনী-কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল,—"ও দাদা! ত্থাখ, ত্থাখ, কি চমৎকার ছবি!"

সচমকে পিছন ফিরিয়া বসন্ত বিস্মিত নেত্রে দেখিল, একটি তরুণী তাহার ছবির উপর হেঁট্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাহার পিছনেই একটি যুবক,—সাহেবী পোষাকে।

যুবকটি আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"তরু, দিন-কে-দিন তুমি বড় অভদ্র হ'য়ে উঠচ!"

এই ভৎসর্নার স্বরে অপ্রস্তুত হইয়া তরুণী বসন্তের দিকে সসঙ্কোচে চাহিল, লজ্জায় তার গালদুটি রাঙা হইয়া উঠিল।

বসন্তের দিকে ফিরিয়া যুবক বলিল, "মশাই, আপনি কে তা জানিনা, কিন্তু আপনার ছবি-আঁকায় ব্যাঘাত দিলুম বলে ক্ষমা-প্রার্থনা করছি।"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! দশজনকে ত্থাখাবার জন্যেই ছবি-আঁকা! আপনারা যে আমার ছবির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেছেন, এজন্যে আমিই ধন্য।"

ভিনয়ে এই অচেনা-চিত্রকরটিকে হারানো শক্ত দেখিয়া যুবক

আর-কিছু না-বলিয়া ছবিখানি ভালো করিয়া দেখিবার জন্য চিত্রাধারের দিকে অগ্রসর হইল। ছবির এককোণে বসন্ত নিজের নাম-সই করিয়াছিল,—ছবি দেখিতে-দেখিতে যুবকের চোখ হঠাৎ সেই নামের উপরে পড়িল এবং তখনি মুখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "অ্যাঁ, মাসিক কাগজে প্রায়ই যাঁর ছবি দেখি, আপনি কি সেই বসন্তবাবু?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

—"আপনিই বসন্তবাবু!"—বলিয়া মহিলাটিও দুই পা আগাইয়া আসিলেন।

যুবক বিরক্ত স্বরে বলিল, "তরুণা, ফের!"

তরুণা থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি আবার পিছাইয়া গেল।

তারপর বসন্তের দিকে ফিরিয়া যুবক বলিল, "মশাই, আমার এই বোনটি কিছু অন্যায়-রকমের চঞ্চল! তার ওপর ও নিজেও কিছু-কিছু আঁকতে জানে বলে, আজ ওর ছেলেমানুষী যেন বেড়ে উঠেছে!"

তরুণার লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া বসন্ত বলিল, "উনিও ছবি আঁকেন বুঝি? শুনে সুখী হলুম!"

যুবক বলিল, "বসন্তবাবু, আপনাকে এর আগে আর-কখনো দেখি-নি বটে, কিন্তু তবু আমরা আপনাকে ভালোরকমেই জানি —আর, বলতে-কি, আমরা আপনার ভক্ত!"

বসন্ত বলিল, "লেখক বা চিত্রকরদের ঐ এক মস্ত সুবিধে আছে, তাঁরা বিদেশ-বিভুঁয়েও পথে-ঘাটে-মাঠে—"

—"এমন কি পাহাড়ে-পর্ব্বতে, গভীর জঙ্গলেও বন্ধু কুড়িয়ে

পান, এই বল্‌তে চান ত? হ্যাঁ বসন্তবাবু, আপনি আমাদের যথার্থই বন্ধু বটে!"

বসন্ত কৃতজ্ঞ স্বরে বলিল, "আমি যে আপনাদের এতটা আনন্দ দিতে পেরেছি, এ আমার ভাগ্যের কথা! কিন্তু আমাদের পরিচয়টা যেন অত্যন্ত একতর্‌ফা হোলো বলে আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে!"

যুবক হাসিয়া বলিল, "অবশ্য, অবশ্য! আমি হচ্ছি রজত-ভূষণ সেন আর ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী তরুণা রায়—আমার ভগ্নী। এর-চেয়ে বেশী করে পরিচয় দিতে পারি, আমাদের এমন গুণ আর কিছুই নেই!"

গ

কয়ঘর রেলওয়ে কর্ম্মচারী ছাড়া গোমোজংসনে লোকজন বড় বেশী নাই; বাঙ্গালী 'বায়ু-ভুক্'রা এখনো এই স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব জায়গাটিকে ভাল-করিয়া চিনিতে পারেন নাই, তাই পূজা বা বড়দিনের ছুটির সময়েও কলিকাতার অসংখ্য বুটের মস্-মসানিতে এবং অট্টহাসির হট্টগোলে গোমোর নীরব পার্ব্বত্য প্রকৃতি সরব হইয়া উঠে না!

কাজেকাজেই এমন নির্জ্জন বিদেশে পরস্পরের দেখা পাইয়া বসন্ত ও রজতভূষণ, দুজনেই বর্ত্তিয়া গেল; এবং তাদের আলাপটাও যথার্থ বন্ধুত্বে পরিণত হইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না।

সেদিন বৈকালের চায়ের বৈঠকে বসন্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা রজতবাবু, আপনার ভগ্নীর স্বামী কি করেন?'

চায়ের পেয়ালায় চিনি দিতে দিতে তরুণা হঠাৎ থামিয়া পড়িল—তার মুখের মৃদু হাসির রেখাটিও সেইসঙ্গে মিলাইয়া গেল।

রজত চায়ের পেয়ালাটা মুখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার ভগ্নীপতির কথা বল্‌ছেন ?"

—তরুণা আর সেখানে দাঁড়াইল না, আস্তেআস্তে হেঁটমুখে চলিয়া গেল।

রজত আবার বলিল, "আমার ভগ্নীপতিটি একেবারেই মানুষ নয়, ব্যারিষ্টারী শিখতে বিলেতে গিয়ে সে আর ফেরবার নাম করে না।"—একটু থামিয়া কিছু ইতস্তত করিয়া বলিল, "বোধ-হয় আর ফিরবেও না !"

বসন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন ?"

রজত বলিল, "শুন্‌ছি সে নাকি মেম বিয়ে করেছে !"

—"বলেন কি !"

—হ্যাঁ। আমার বোনের অদৃষ্ট ! বাইরে বালিকা হলেও তরুণার মনটা বোধ হয় আর তরুণ নেই।"

বসন্ত একটা সিগারেট ধরাইয়া সাম্‌নের মাঠের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল—

—রজতও আর কিছু বলিল না।.........

খানিক পরে পাণের ডিবা হাতে করিয়া তরুণা ফিরিয়া আসিল। বলিল, "বসন্তবাবু, পাণ খান।"

বসন্ত ব্যথিত দৃষ্টিতে একবার তরুণার দিকে চাহিয়া, ডিবা হইতে একটি পাণ তুলিয়া লইল।

বসন্তের সাম্‌নে একখানা বেতের মোড়ায় বসিয়া পড়িয়া তরুণা

বলিল, "কাল্‌কে আপনি যে বললেন, আমাকে মডেল করে একখানি ছবি আঁকবেন, তার কি হোলো বসন্তবাবু?"

তরুণার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে-ভাবিতে বসন্ত বলিল, "না না—সে থাক্‌, তাতে আপনার কষ্ট হবে!"

তরুণা মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, কিচ্ছু কষ্ট হবে না!"

রজত বলিল, "বসন্তবাবু, আপনার ছবির মডেল হোতে তরুর যখন এতই সাধ, তখন আপনি ইতস্তত করছেন কেন?"

বসন্ত তখন রাজি হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে কাল সকাল থেকেই কাজে লাগব!"

তরুণা হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওহো, কি মজা! বসন্তবাবুর ছবির সঙ্গে আমিও অমর হব!"

যুবতী তরুণার সেই বালিকার মত সরল হাসি-হাসি মুখখানির দিকে বসন্ত-মুগ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল।......

আজ একমাস ধরিয়া রোজই সে সকালে-দুপুরে বিকালে-সাঁঝে এই তরুণাকে দেখিতেছে, কিন্তু তার আসল স্বভাবটি কিছুতেই ধরিতে পারিল না! প্রাচীন বাঙ্‌লা পুঁথির মত তরুণাকে যেন কতক বোঝা যায়, কতক যায় না। সে যখন তার আঁকা ছবিগুলি একটু-আধটু সুধরাইয়া দেয়, তরুণা হয়ত তখন অত্যন্ত অসঙ্কোচে তাহার কাঁধের উপরেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া অবাক হইয়া তার নিপুণ হাতের তুলির টানগুলি দেখিতে থাকে! তখন বসন্তই হয়ত ব্যস্ত হইয়া একটু সরিয়া বসিত, কিন্তু তরুণা তাতে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিত না—তার মত যুবতীর পক্ষে যে এটা অত্যন্ত অশোভন, এ বুদ্ধি তার মাথায় ঢুকিত না! অথচ তাহার

সমস্ত হাবভাবের ভিতরেই এমন একটি সহজ সরলতা থাকিত, যাতে-করিয়া তাকে কেউ বেহায়া বলিয়াও ভাবিতে পারিত না।

..... কচিবয়সে বাপ-মা হারাইয়া একমাত্র ভাইয়ের হাতে সে মানুষ হইয়াছিল। রজত কিছু পাগ্‌লাটে ধরণের লোক; দুটি জিনিষকে সে সমান অন্যায়, অসহ ও যুক্তিহীন ভাবিত—বিবাহ এবং বাঙ্‌লা মাসিকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা! এ দুটি জিনিষকে আজ-পর্য্যন্ত সে সন্তর্পণে তফাতে রাখিয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক না-থাকার দরুণ তরুণা পুরুষের মতই স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মেম-শিক্ষয়িত্রীর কাছে সে বই-মুখস্থ করিয়াছিল তোতাপাখীর মত, কিন্তু বাঙালী-মেয়ের যেমন শিক্ষার দরকার তার কিছুই পায় নাই।......

বিবাহিত জীবন ভোগ করাও তরুণার কপালে ঘটে নাই। বিবাহের পরেই তার স্বামী রজতের টাকাতেই বিলাতে চলিয়া যান। স্বামীর লেখা একখানি-মাত্র চিঠি তার হাতে আসিয়াছিল—তারপর হইতেই তিনি নীরব। এখন সে এই নীরবতার কারণ শুনিয়াছে—তার স্বামী এখন আর তার নয়, বিলাতে তিনি নূতন সংসার পাতিয়াছেন—হয়ত এতদিনে কতকগুলি 'অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানে'র 'ফাদার' হইয়াছেন। কিন্তু এ আঘাত তরুণার কোমল প্রাণে যে কতটা বাজিয়াছিল, তার হাসিখুসি ও নিশ্চিন্ত চঞ্চলতা দেখিয়া বাহির হইতে কেহই সেটা আন্দাজ করিতে পারিত না। নির্ঝরের তরল ধারার তলাতেই যে জমাট্ পাথর থাকে, সংসারের চোখে সে সত্য সহজে ধরা পড়ে না।

ঘ

যেখানে নিভৃত পাহাড়ের শীতল ছায়ায়, একখানি কালো পাথরের গায়ে নিকষে সোনার দাগের মত গুটিকয় শিশিরে-ভেজা হল্‌দে ফুল ফুটিয়াছিল এবং ঠিক তারই তলায়, বাধা পাইয়া নদীর জলতরঙ্গে কলরাগিণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, বসন্ত সেইখানটিতে লইয়া গিয়া তরুণাকে বসাইয়া দিল।

বসন্তের ছবির বিষয়, 'কায়া ও ছায়া।' নদীর ধারে এক-খানি পাথরের উপর বসিয়া, এক রূপসী চপলজলে আপনার চঞ্চল রূপের লীলাচ্ছায়া দেখিয়া সরল পুলকে হাসিয়া উঠিতেছে —এই ছিল তার পরিকল্পনা।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এমন করে বসে থাকতে কষ্ট হবে না ত ?"

—"না, না, না ! কতবার বল্‌ব বসন্তবাবু !"

তরুণার রাগ দেখিয়া বসন্ত হাসিয়া বলিল, "বেশ, বেশ তাহোলেই হোলো !"—তারপর, সে ক্ষিপ্রহস্তে ভবিষ্য ছবির একটা মোটামুটি নক্সা আঁকিয়া লইতে লাগিল।

রজতও সঙ্গে আসিয়াছিল। সে মনে-মনে প্রমাদ গণিয়া বলিল, "এদের সময় ত দেখছি তোফা কেটে যাবে—কিন্তু আমি কি করি ! আচ্ছা, এদিকে-ওদিকে পা-দুটোকে একটু চালিয়ে নিয়ে আসা যাক্ !"—নানা জীবজন্তুর পদচিহ্ন-লেখা নদীর চরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া, রজত আঁকা-বাঁকা তীর ধরিয়া আপন-মনে আগাইয়া গেল,—তরুণা বসিয়া-বসিয়া দেখিতে লাগিল, জলের ধারে একটা মহা-গম্ভীর বক এক ঠ্যাং তুলিয়া স্থির

হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেও যেন তার মত নিজের ছবি তুলাইতে চায়!

৬

এম্‌নি ভাবে কয়েকদিন কাটিল। বসন্ত রোজ সকালে ও বিকালে একমনে ছবি আঁকে, তরুণা একমনে বসিয়া থাকে, আর তাহাদের ধৈর্য্যের অসীম বহর দেখিয়া রজত মনে-মনে বেজায় গরম হইয়া ওঠে! "এই তুই আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়ে মাঝখান থেকে আমি-বেচারী স্রেফ্‌ মারা পড়ব দেখ্‌ছি —উঃ, আর ত পারা যায় না বাবা!"

—এই বলিয়া রজত সেদিন বিরক্তিভরে দাঁড়াইয়া হাত ছড়াইয়া আগে একটা মস্ত হাই তুলিল, তারপর আমলকী-বনের ভিতর দিয়া, সাম্‌নের পাহাড়ে উঠিতে লাগিল।...

ছবি আঁকিতে-আঁকিতে বসন্ত বিভোর চোখে দেখিল, পাথরের উপরে আঁচল ছড়াইয়া তরুণা একগোছা বনফুল তুলিয়া, ঘাসের ডোরে আনমনে তোড়া বাঁধিতেছে; তার প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানি পড়ন্ত রোদে লাল-টুকটুকে হইয়া উঠিয়াছে, চোখদুটি শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িয়াছে।

সেদিনকার মত সে ছবি-আঁকা শেষ করিবে ভাবিতেছে—এমনসময়ে তরুণা হঠাৎ সভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল, "মাগো—"

—"কি—কি হোলো?"

—"সাপ—সা—" তরুণার আড়ষ্ট মুখ দিয়া আর বাক্য সরিল না।

—"সাপ !" বসন্তের হাত হইতে প্যালেট্ ও তুলি খসিয়া পড়িয়া গেল। একলাফে সে তরুণার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—তরুণাও আতঙ্কে অজ্ঞানের মত একেবারে দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের ভিতরে মুখ লুকাইল !

চকিতে পাথরের উপর একটা সাপ কালো বিদ্যুতের মত তীব্রবেগে বাহির হইয়াই মিলাইয়া গেল!...... বসন্ত অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল;—সর্পভয়ে নয়, তরুণার সেই অভাবিত স্পর্শে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল !

অনেকক্ষণ পরে তরুণা চোখ চাহিয়া মুখ তুলিল—তখনো তার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে, দৃষ্টি স্তম্ভিত, দেহ থর্‌থর্ কাঁপিতেছে ! থামিয়া-থামিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "সাপটা চলে গেছে ?"

বসন্ত বিহ্বলের মত বলিল, "হুঁ !"

তখন তরুণার হুঁশ্ হইল,—নিজের অবস্থা বুঝিয়া সচমকে সে বসন্তকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল—তার ভয়-ভরা পাংশু মুখখানি গভীর লজ্জায় আবার আরক্ত হইয়া উঠিল ! তরুণার খোঁপা খুলিয়া তার ধব্‌ধবে গৌর গ্রীবার উপরে এলাইয়া পড়িয়াছিল,—বসন্তের দিকে পিছন ফিরিয়া সে ফের নিজের চুল বাঁধিতে লাগিল।

বসন্ত তখনো নির্ব্বাক—নিজের বুকের অধীর স্পন্দন সে বুঝি শুনিতে পাইতেছিল !...... তরুণার অপূর্ব্ব স্পর্শটুকু তখনো তার দেহের ভিতরে শিরায়-শিরায় যেন তরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল !

ভালো-করিয়া শালখানা মুড়ি দিয়া তরুণা প্রায় আপনা-

আপনি বলিল, "দাদা বুঝি এখনো পাহাড় থেকে নামেন-নি ?"

বসন্ত কোন সাড়া দিল না।

অস্তাচলের ভাঙা মেঘে তখন যেন রক্তগঙ্গা বহিতেছে—তাহারই ভিতরে সূর্য্য কখন্ তলাইয়া গিয়াছে,—কেউ তা লক্ষ্য করে নাই। চারিদিক নীরব নির্জ্জন—সুধু অশ্রান্ত নদীর শান্ত কল্লোলের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দূর হইতে দু-একটা পাখীর স্বর ও গৃহগামী গাভীর ডাক হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে।

বনভূমির একান্ত স্তব্ধতায় তরুণার প্রাণটা কেমন দুপ্ দুপ্ করিয়া উঠিল। শোনা যায়-কি-না-যায় এম্নি স্বরে সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "বসন্তবাবু, চলুন, বাড়ী যাই !"

যেন স্বপ্ন দেখিতেছে—ঠিক তেমনিভাবে চাহিয়া বসন্ত আস্তে-আস্তে ডাকিল, "তরুণা,—তরুণা !"

নাম ধরিয়া বসন্ত এই তাকে প্রথম ডাকিল! তরুণা চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বসন্ত অপলক চোখে তার মুখপানে তাকাইয়া আছে—সে দৃষ্টির সাম্নে শিহরিয়া উঠিয়া সে আবার মাথা নীচু করিল।......... সেও যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের মত দেখিল, বসন্ত ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল, তারপর তার কম্পমান হাতদুখানি নিজের দু-হাতে চাপিয়া ধরিল, এবং তার মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি আবেগভরে বলিল, "তরুণা, আমি তোমাকে ভালোবাসি !"......... বসন্তের হাতের ভিতরে আপনার অসাড় হাত রাখিয়া, এবং তার ঘনঘন তপ্তশ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া, তরুণা একেবারে এলাইয়া নদীর তীরে বসিয়া পড়িল—এবং অস্ফুট প্রতিধ্বনির মত তার কাণের কাছে রহিয়া-রহিয়া সেই

একই কথা জাগিতে লাগিল—"আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি !"... ..

হঠাৎ একঝাঁক বক ডানার ঝটপট্ শব্দ তুলিয়া তাহাদের মাথায় উপর দিয়া সারে সারে উড়িয়া গেল !—

—সেই শব্দে স্বপ্ন হইতে তারা সচমকে জাগিয়া উঠিল, অত্যন্ত মলিন মুখে তরুণার হাত ছাড়িয়া বসন্ত তাড়াতাড়ি পিছনে সরিয়া দাঁড়াইল এবং তরুণা মাটির উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—হৃদয়ের উত্তেজনা আর সে সহ্য করিতে পারিল না !.........সে কান্না বসন্তের মাথা একেবারে হেঁট করিয়া দিল, সে যেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশাইয়া গেল ! এত অল্পক্ষণে এমন অঘটন ঘটিতে পারে সে তা জানিত না ! সে কি হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছিল ?

একটু দূরে একটা শব্দ হইল। বসন্ত মুখ তুলিয়া দেখিল, পাহাড়ের উপর হইতে জঙ্গল সরাইয়া রজত নামিয়া আসিতেছে। ভয়ে অপমানে লজ্জায় কাঠ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল,—সে যে গুরুতর পাপ করিয়াছে এখনি সব প্রকাশ হইয়া যাইবে, তখন সে কি আর কোথাও মুখ দেখাইতে পারিবে ?

আসিতে-আসিতে দূর হইতেই রজত বলিয়া উঠিল, "কি বসন্তবাবু, ছবি আঁকা হোলো ত ?"

রজতের গলা পাইয়া পলক না-পড়িতে তরুণাও উঠিয়া দাঁড়াইল। বসন্তের আকস্মিক আচরণে তরুণা যে আঘাতটা পাইয়াছিল, ততক্ষণে সে তা সামলাইয়া লইয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে দাদার দিকে ছুটিয়া গেল।

তরুণার দিকে চাহিয়া রজত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "হ্যাঁরে তরু—একি! তোর চোখে জল কেন?"

বসন্তের সাম্‌নে পৃথিবীর সমস্ত আলো হঠাৎ যেন দপ্‌-করিয়া নিবিয়া গেল!

দাদা তার চোখের জল দেখিতে পাইয়াছেন! তরুণা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল;—কিন্তু তার সে ভাব ক্ষণিকের জন্য,—পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিয়া দাদার হাত ধরিয়া বলিল,—"দাদা, দাদা, একটা মস্ত সাপ বেরিয়েছিল—আরেকটু হোলেই আমাকে কাম্‌ড়ে দিত আর-কি, ভাগ্যে বসন্তবাবু ছিলেন, তাই—"

রজত তড়াক্ করিয়া তিনহাত-উঁচু এক লাফ মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে! সাপ? অ্যাঁ! সাপে কাম্‌ড়ালে মানুষ যে আর বাঁচে না, জানিস্ না বুঝি? সাপ—বলিস্ কি রে—কৈ, কোথায়?"

তরুণা হাসিতে-হাসিতে সকৌতুকে বলিল, "সাপ কি আর তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চুপ মেরে বসে আছে দাদা, সে অনেকক্ষণ নিজের ধান্দায় চলে গেছে!"

তরুণার হাসিতে মহা চটিয়া রজত বলিল, "সব সময়ে-তোর হাসি ভালো লাগে না, থাম্ বলচি তরু! সাপ বেরিয়েচে বলে হাসি! দিন-কে-দিন তুই যেন বেশী ছেলেমানুষ হয়ে উঠ্‌ছিস্!"

দাদার রাগ দেখিয়া তরুণার হাসি আরো বাড়িয়া উঠিল।

চ

পরদিন সকালে রজতের বাড়ীতে চায়ের বৈঠকে বসন্তের দেখা পাওয়া গেল না। ... ...

বিকালে বসন্ত বসিয়া-বসিয়া চিন্তিতমুখে জিনিষপত্তর গুছাইতেছিল ও মোটমাট বাঁধিতেছিল, এমন সময়ে রজত ও তরুণা আসিয়া হাজির!

রজত বলিল, "হ্যাঁ বসন্তবাবু, হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছেন কেন বলুন দেখি? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েচে বুঝি? একি, এত মোট-মাট বাঁধা হচ্ছে যে!"

বসন্ত বাধ'-বাধ' স্বরে বলিল, "কাল সকালের গাড়ীতে কল্‌কাতায় যাব ভাবচি!"

—"অ্যাঁ, কল্‌কাতায়! আমাদের খবর না-দিয়েই?"

তরুণা অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বসন্তবাবু, আপনি বেশ মানুষ ত! না—না, সে হচ্ছে না! আমাদের একলা ফেলে চোরের মত চুপিচুপি পলায়ন! এ অন্যায় বসন্তবাবু, এ অন্যায়!"

বসন্ত শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমাকে মাফ করুন—এ জায়গাটা আমার আর ভালো লাগ্‌চে না।"

তরুণা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, আপনার যাওয়া অসম্ভব! এখনো আমার ছবি শেষ হয়-নি, এখনো ছবিতে আমার নাকটা খ্যাঁদাই হয়ে রয়েছে! নিন—উঠুন, রং টং নিয়ে চটপট্ বেরিয়ে পড়ুন।"

বসন্ত অত্যন্ত দমিয়া গিয়া বলিল, "না না, ছবি আঁকতে যেতে আমি আর পারব না!"

রজত যেন ঠিক কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছে, এমনি ভাবে হাসিয়া বলিল, "ও, আপনি বুঝি সাপের ভয়ে নদীর ধারে যেতে চাইছেন না? বসন্তবাবু, কুছ্ পরোয়া নেই, আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি—এই দেখুন, সাপ দেখেছি কি মেরেচি!"—এই বলিয়া রজত তার হাতের মাথা-সমান-উঁচু মোটা বাঁশের লাঠিটা সগর্ব্বে তুলিয়া ধরিল।

তরুণা তার দাদার রকম-'সকম' দেখিয়া আর হাসি রাখিতে পারিল না। তারপর মুখে কাপড়-চাপা দিয়া কোন-রকমে হাসি থামাইয়া, বসন্তের হাত ধরিয়া বলিল, "তবে আর কি, দাদা লাঠি-কাঁধে পাহারা দেবেন আর আপনি অকুতোভয়ে ছবি আঁকবেন! দাদা আজ সর্প-বংশ সমূলে ধ্বংস করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছেন! নিন—নিন, উঠুন, আর দেরি করবেন না!"

খুবই ইতস্ততের সহিত বসন্ত উঠিল,—তরুণার প্রতি কথা, প্রতি হাসি তীরের মত তার বুকের মাঝখানে গিয়া বিঁধিতেছিল, তার মুখের দিকে লজ্জায় অনুতাপে সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না!

ছ

নদীর ধারে গিয়া রজত আগে তন্নতন্ন করিয়া—তরুণা যেখানে বসে সেখানটা—খুঁজিয়া দেখিল। তারপর মুরুব্বিআনার সহিত বলিল, "তরু, তুমি এখন বসতে পার, সাপ আর নেই। হুঁ, সাপ দেখেচি কি মেরেচি!"—বলিয়া লাঠি দিয়া সজোরে ঠকাস্ করিয়া পাথরের উপরে অদৃশ্য সাপের উদ্দেশে একটা প্রচণ্ড আঘাত করিল!

তরুণা বলিল, "তুমি আজ যে প্রকাণ্ড লাঠি এনেচ দাদা, তাতে সুধু সাপ কেন, বাঘ-ভাল্লুক পর্য্যন্ত ল্যাজ তুলে এ মুল্লুক ছেড়ে পালাবে !"

—এই বলিয়া সে পাথরখানার উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল।

রজত ততক্ষণে চারিধারে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সাপ খুঁজিতে লাগিয়া গিয়াছে। যেখানে কোন-একটা গর্ত্ত-'টর্ত্ত' কিছু দেখে, সেইখানেই আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত লাঠিটা ভিতরে ঢুকাইয়া দেয় আর বলে, "আজ সাপ দেখেচি কি মেরেচি !" এম্‌নি করিতে করিতে সে খানিক তফাতে চলিয়া গেল।

বসন্ত তখনো তুলি হাতে করিয়া অপরাধীর মত ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে।······একবার ফিরিয়া দেখিল, তরুণা ঠিক সহজভাবেই বসিয়া ঘাসের ডোরে বনফুলের তোড়া বাঁধিতেছে !

অনুতপ্ত স্বরে সে বলিল, "আপনি কি—"

তরুণা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কাল আমার নাম ধরে ডেকে আজ ফের 'আপনি' কেন বসন্তবাবু? আমাকে 'তুমি' বলে ডাকুন !"

এ বিদ্রূপ, না কৌতুক ? কিছুই না বুঝিয়া আরো কাতর হইয়া বসন্ত বলিল, "আমাকে—"

বাধা দিয়া দুষ্ট তরুণা বলিল, "থাক্ বসন্তবাবু, থাক্ ! আপনি কি বল্‌তে চান আমি বুঝেছি—ক্ষমা করবার কথা বল্‌বেন ত ? দরকার কি !"—বলিয়া, সে সদ্য-বাঁধা ফুলের তোড়াটি নাকের কাছে ধরিয়া একমনে তার গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।

বসন্ত সত্যসত্যই ক্ষমা চাহিতে যাইতেছিল; কিন্তু এই কথায় তার মুখ একেবারে বোবা হইয়া গেল। তার মনে হইল, তরুণা যেন একটি মূর্ত্তিমতী প্রহেলিকা—কোনদিক দিয়াই তার মনের ভিতরটা ধরিবার-ছুঁইবার যো নাই, এ কি আশ্চর্য্য!

বসন্ত হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া আছে,—এমনসময় তরুণা হাসিতে-হাসিতে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া তার কাছে উঠিয়া আসিল। আগে বনফুলের ছোট তোড়াটি যত্নের সহিত বসন্তের জামায় বোতামের ছেঁদায় ঢুকাইয়া দিল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কোমল অথচ ব্যথাভরা স্বরে আস্তে-আস্তে বলিল, "বসন্ত-বাবু, কাল্‌কের কথা ভেবে আপনি অমন কিন্তু হয়ে আছেন কেন? কী আর আপনি করেছেন? আমাকে ভালোবাসেন, এই বলেছেন বৈ ত নয়? তাতে হয়েছে কি? কেন আপনি আমাকে ভালোবাসবেন না—ভাই কি বোনকে ভালোবাসে না!"—একটু থামিয়া, বসন্তের মুখের দিকে ছলছল চোখে চাহিয়া, তার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "আর আমাকে ভুল্‌বেন না—ছোট বোনটি বলে মনে রাখ্‌বেন!"

বসন্তের চোখদুটি অশ্রুজলে ছাপিয়া উঠিল।

তরুণা আবার একছুটে পাথরের উপরে গিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "দাদা, ও দাদা! সাপ-টাপ্ কিছু পাওয়া গেল কি?... ...বসন্তবাবু, নিন নিন, তাড়াতাড়ি ছবি আঁকুন, ছবিতে আমার নাক এখনো থ্যাদা-থ্যাদা দেখাচ্ছে—তুলি বুলিয়ে নাকটাকে শীগ্‌গির টিকলো করে তুলুন!"

মেঘের ছায়া

ক

ট্রেণ থেকে যখন নাম্‌লুম, তখন ঝিকিমিকি বেলা।

মাঠের পারে কচি-সবুজ বনভূমির শিয়রে, নিরেট্ ধোঁয়ার মত কালো মেঘের বুকের উপরে, চপলার তরাস-ভরা চোখের ইঙ্গিত জেগে উঠ্‌ছে বারংবার।

যেতে হবে অনেকখানি; ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনায় মনটা কেমন ভোরে এল। আমার এখানে আস্‌বার কথা ছিল সকালে। তখন যদি আস্‌তুম, জমিদার-বাড়ীর পাল্‌কি পেতুম। কিন্তু দৈবগতিকে তখন আস্‌তে পারি-নি; সুতরাং এবেলা সুধুই নিজের শ্রীচরণ-ভরসা।

বেয়ারাকে পিছু নিতে বলে, যতটা তাড়াতাড়ি পারলুম, পা চালিয়ে দিলুম।

কিন্তু মেঘেরা বোধ হয় আমার মত্‌লোব ধরে ফেল্‌লে। কারণ, হঠাৎ তারা এত চট্‌পট্ এগিয়ে এল যে, খানিক পরে আকাশের এধার-থেকে-ওধার-পর্য্যন্ত খালি দেখা যেতে লাগ্‌ল, মেঘের পর মেঘের ছুটোছুটি,—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে, ক্ষ্যাপা বাতাস টল্‌মলে গাছের মাথায় মাথায় মাতামাতি করে' বেড়াতে লাগ্‌ল।

বেয়ারা বল্‌লে, "বাবু, এখুনি ঝড় উঠ্‌বে!"

—"আইত দেখ্‌চি রে, কি করা যায় বল্ দেখি?"

"এইবেলা ঐখানে গিয়ে উঠি চলুন"—বলে সে একদিকে আঙুল তুলে দেখালে।

খানিক তফাতেই বেড়-বাতাড়ের মাঝখানে একখানা হেলে-পড়া নড়্‌বোড়ে চালা-ঘর। তার পিছনেই একটা মস্ত বাঁশঝাড়, বাতাসের তালে তালে ক্রমাগত মাথা-নাড়া দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে দোল খাচ্ছে আর খাচ্ছে!

ওদিকে মাঠের উপরে ধূলোর ধ্বজা উড়িয়ে, বিচিত্র কলরব তুলে আচম্‌কা ঝড়ের আবির্ভাব হ'ল—সেইসঙ্গেই তীব্র-একটা অগ্নি-স্রোতে আকাশের বুক ভাসিয়ে ফুটে উঠ্‌ল বজ্রের প্রচণ্ড অট্টহাস্য!

—"আমার দাদা বাজ্ পড়ে মরেছিল বাবু"—বলেই আমার বেয়ারাটা তার মনিবকে পিছনে ফেলে, সেই চালা-ঘরখানার দিকে ঘাড় গুঁজে চোঁচা দৌড় মার্‌লে।

কিন্তু তখন তার বেয়াদফি দেখে রাগ করবার সময় আমার ছিল না। আমিও ছুটলুম।

খ

দাওয়ায় উঠে দস্তুরমত হাঁপাচ্ছি—হঠাৎ পিছন থেকে শুন্‌লুম, "তোমরা কে বাছা?"

ফিরে দেখি, একটা বুড়ী আমার মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা দেখেই বুঝলুম, ভারি গরীব সে।

বল্‌লুম, "আমরা ঈশানপুরের জমিদার-বাড়ী যাচ্ছিলুম, হঠাৎ দুর্যোগ দেখে তোমাদের বাড়ীতে এসে উঠেছি।"

বুড়ী আমার আগা-পাশতলায় স্তিমিত দৃষ্টি বুলিয়ে সসম্ভ্রমে

জিজ্ঞাসা করলে, "তা বেশ করেচ, এসেচ বাবা—এত আমাদের পরম ভাগ্যি! হ্যাঁ বাবা, তুমি কি জমিদার-বাবুদের কেউ হও?"

আমার বেয়ারাটা বলে উঠ্‌ল, "না রে বুড়ী না! আমাদের বাবু কল্‌কাতার খুব হোম্‌রা-চোম্‌রা উকিল, অনেক টাকা ওঁর আয়,—বড় বড় সায়েব-জজ পর্য্যন্ত ওঁর কথা মেনে চলে—বুঝেচিস্? জমিদার বাড়ীতে যাচ্চেন মাম্‌লার তদ্বিরে।"

আমার প্রতি বুড়ীর সম্ভ্রমের বহর যাতে বেড়ে ওঠে, সেই জন্যেই বেয়ারাটা এই বেয়াড়া জাঁকের কথাগুলো শুনিয়ে দিলে। তার ওপর-চালাকি আমার কিন্তু ভালো লাগ্‌ল না। সে আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল—ধমক খেয়ে থেমে গেল।

বুড়ী বল্‌লে, "বাবা, এমন করে কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, যে ধুলো উড়চে! এস, ভেতর এস।"

বুড়ীর পিছনে পিছনে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। ছোট মেটে ঘর—স্যাঁৎসেতে, অন্ধকার। খড়ের আঁটি, ঘুঁটের বোঝা, দড়ি-দড়া, চটের বস্তা, হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোসন, চৌকি-খাচা, ঝুড়ী-খোড়া, ছেঁড়া-মাদুর, চাদরহীন বিছানা, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিস প্রভৃতি হরেক রকমের ছোট-বড় জিনিষ সেই একখানি-মাত্র ঘরের মধ্যে চারিদিকে যেখানে-সেখানে ছড়ানো রয়েছে। এর মাঝে মানুষের ঠাঁই হয় কি করে, অবাক হয়ে তাই ভাব্‌ছি, এমন সময়ে বুড়ী ডেকে বল্‌লে, "খেঁদি, অ খেঁদি, একখানা পিঁড়ি আন্‌ত বাছা!"

"পিঁড়ি কি হবে ঠান্‌মা?"—বলে যে মেয়েটি আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, এই দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে আমি একেবারে দেখবার

প্রত্যাশা করি-নি! তার বয়স হবে বছর দশ; রংটি শাম্‌লা, গড়নটি গোলগাল, মুখ-চোখ চমৎকার। সে আস্‌ছিল নাচের ভঙ্গিতে হেল্‌তে দুল্‌তে, হঠাৎ আমাকে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় বেঁকিয়ে অপলক চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল, "তুমি আবার কোত্থেকে এলে?"

বাঃ, এর প্রশ্ন শুন্‌লে মনে হয়, এর-সঙ্গে যেন আমার অনেক-দিনের জানাশুনো!

আমি বল্‌লুম, "আকাশ থেকে।"

খেঁদি বিশ্বাস করলে না। চোখ কুঁচ্‌কে বল্‌লে, "আমার সঙ্গে ঠাট্টা?"

—"তবে তোমার সঙ্গে কি কর্‌ব? গল্প শুন্‌বে?"

খেঁদি এগিয়ে এসে একেবারে আমার হাত ধরে বল্‌লে, "গপ্প? ওঃ, গপ্প আমি বড্ড ভালোবাসি! ঠাকুমা ভারি দুষ্টু, রোজ রোজ খালি এক গপ্পই বলে! তুমি নতুন গপ্প-টপ্প কিছু জানো?"

খেঁদি দেখ্‌ছি, এক কথায় আমার সঙ্গে দিব্যি ভাব করে নিলে! আমি বল্‌লুম, "হুঁ, নতুন গল্প জানি বৈকি!"

—"ক'টা জানো?"

—"তুমি যত শুন্‌তে চাইবে তত বল্‌তে পারি।"

—"কৈ, বল না!" এই বলে খেঁদি আমাকে নিয়ে রীতিমত জমিয়ে বস্‌বার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে পাশ থেকে একটা কর্কশ স্বর শুন্‌লুম,—"দেখ একবার মেয়ের রকমটা!"

এ ঘরে আরো লোক আছে! সচকিতে ফিরে দেখি, খড়ের গাদার এককোণে একটা হাড়-চামড়াসার বুড়ো থুত্থুড়ো মূর্ত্তি একেবারে যেন খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে, আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে! তরল অন্ধকারের মধ্য থেকে সুধু তার চোখদুটো মাঝে মাঝে নড়ে উঠছিল! আচম্‌কা দেখ্‌লে মনে হয়, এ যেন গঙ্গাযাত্রী রোগী!

সেই মূর্ত্তি তার বেরিয়ে-পড়া চোখদুটো আরো-বেশী ড্যাবডেবে করে, খন্‌খনে গলায় বল্‌লে, "হ্যাঁ রে খেঁদি! তোর কি একটুও আক্কেল নেই রে? যে আস্‌বে তার কাছেই গল্প শুন্‌তে চাওয়া? ভারি মজা পেয়েছিস্ না?"—বলেই সে সাঁই-সাঁই করে এম্‌নি বিষম হাঁপাতে লাগ্‌ল যে, আমার ভয় হ'ল—যায় বুঝি বা বুড়ো দম-আটকে এখনি মরে!

খেঁদি চুপি-চুপি আমার কাণে কাণে বল্‌লে, "ঠাকুদ্দা ভারি বকে! ঠাকুমা বলে বুড়োর ভীম্‌রতি হয়েচে! আর-একটু পরে গপ্প শুন্‌ব—বুঝলে?"

গ

বৃষ্টি ত থামলই না—উল্টে আরো বেড়ে উঠল। একবার ঘরের দরজা খুলে দেখলুম,—অন্ধকারের মস্ত-একটা ঘেরাটোপের মধ্যে আকাশ আর পৃথিবী যেন মিলেমিশে একসা হয়ে গেছে! আমি মহাসমস্যায় পড়ে গেলুম। রাতও ক্রমে বেড়ে উঠছে, আমি এখন যাই কোথায়?

খেঁদির ঠাকুমা বোধ হয় আমার মনের ভাবটা ধরে ফেল্‌লে। সে বল্‌লে, "এ বৃষ্টিতে তোমার ত যাওয়া হ'তে পারে না

ঠাকুমা, তুই—যাঃ! আমি এখন গল্প শুন্‌ব!”—এই বলে সে একেবারে আমার কোল ঘেঁসে বসে আমার মুখটা জোর করে’ টেনে তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার বল্‌লে, “ঠাকুমার সঙ্গে আর কথা কইতে হবে না, এবার আমাকে গল্প বল!”

ঘ

ভোরের বেলায় উঠে ব্যাগটা গুছিয়ে-গাছিয়ে নিচ্ছি, বুড়ী এসে ঘরে ঢুক্‌ল। তার হাতে একবাটি গরম-দুধ আর খানকতক বড় বড় বাতাসা।

আমি বল্‌লুম, “ও-সব কি হবে?”

বুড়ী বল্‌লে, “বাবা, গরিবের ঘরে এসেচ, গরিবের মতই একটু জল খেয়ে যাও! অনেকখানি হাঁট্‌তে হবে, সকাল-বেলায় খালি-পেটে ত যেতে দেব না!”

বুড়ীর মনের পরিচয় যতই পাচ্ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। আমার মত অচেনা এক পথিককে কাল থেকে এরা যে যত্ন-ভালবাসা দিয়েছে, তা আমি আর-কখনো ভুল্‌ব না!

আস্তে আস্তে একখানি দশটাকার নোট বার করে’ বুড়ীর হাতে দিতে গেলুম।

বুড়ী ঘাড় নেড়ে জিভ্‌ কেটে বল্‌লে, “অতিথ্‌-সেবা পুণ্যির কাজ—পুণ্যি কি ব্যাচা-কেনার জিনিষ বাবা? ও-টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও!”

খড়ের গাদার পাশ থেকে আওয়াজ এল, “নে না মাগী! বাবু দয়া করে যা দিচ্চে সেটা নিতে দোষ কি? আমরা ত আর চেয়ে নিচ্চি না!”

বুড়ী বেজায় চটে বলে উঠ্‌ল, "মিন্সেকে বাহাত্তুরে ধরেচে! ওর কথায় কাণ দিও না বাবা, টাকা পেলে ও সব কর্‌তে পারে! টাকা আমি চাই না, খালি এই আশীর্ব্বাদ করে যাও—আমার খেঁদি যেন সুখে থাকে, তার মুখে হাসি দেখে আমরা যেন চোখ্‌ বুঁজতে পারি!"

খেঁদির ঠাকুর্দ্দা হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "কি বল্‌ব মরে আছি! হাতী যখন খানায় পড়ে ব্যাঙও তখন লাথি মারে!"

... ...

দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখি আকাশ পরিষ্কার—ভোরের চিক্কণ রোদে গাছের জল-ভরা পাতাগুলি মণি-মুক্তার মত ঝল্‌মল্‌ করছে।

সাম্‌নেই পেয়ারা-গাছের একটা ডালে খেঁদি আর একটি পনেরো ষোল বছরের জোয়ান ছেলে পাশাপাশি বসে একমনে পেয়ারা খেতে ব্যস্ত। আন্দাজে বুঝলুম ঐ ছেলেটিই শ্রীদাম।

বাল্য-প্রেমের এই সরল লীলাটি আমার চোখে এমন ভালো লাগল যে, তখনি ব্যাগ থেকে ফোটোগ্রাফের 'কোড্যাক' বার করে' একখানা ছবি তুলে নিলুম। কল্‌কাতা ছেড়ে বাইরে বেরুলেই বরাবর আমি একটা 'কোড্যাক্‌' নিয়ে আসি—নতুন কিছু দেখ্‌লেই তখনি ছবি তুলে নি।......

খেঁদি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই একলাফে নীচে নেমে পড়ল। তারপর মাথার চুল উড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে আর এক পায়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার কাছে ছুটে এসে বল্‌লে, "একটা পেয়ারা খাবে? ভারি মিষ্টি!" এই বলে জোর করে' আমার হাতে একটা পেয়ারা গুঁজে দিয়ে বললে, "নাও, খেয়ে ফেল!"

আমি বল্লুম, "খেঁদি, গাছের ওপরে ও কে ?"

খেঁদি মুখ গম্ভীর করে বল্লে, "ঐ ত আমার বর !"

—"এর-মধ্যে ফের ভাব হয়ে গেছে বুঝি ?"

খেঁদি আঙুল দিয়ে বরকে দেখিয়ে বল্লে, "ছিদামটা ভারি নেই-আঁকড়া। আমার সঙ্গে সেধে সেধে ভাব কর্লে— কিছুতেই ছাড়্লে না যে !"

—"বেশ, বেশ, তুমি এখন আবার তোমার বরের কাছে যাও, নইলে সে রাগ করবে ! আমিও চল্লুম।"

চকিত চোখে খেঁদি বল্লে, "কোথায় চল্লে তুমি ?"

—"আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি।"

—"আর আস্বে না ?"

—"বোধ হয় না।"

খেঁদি একেবারে দু-হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বল্লে, "হুঁ, যাবে বৈকি ! আমি তোমায় ছেড়ে দেব না।"

—"সে কি খেঁদি, ছেড়ে দেবে না কি ? আমি কি তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে এসেছি ? ছাড়ো, ছাড়ো !"

অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সে আমার দিকে তার দুটি করুণ নয়ন তুলে বল্লে, "বল, আবার আস্বে ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আস্ব বৈকি !"

—"বল আস্ব, আস্ব, আস্ব—তিন সত্যি গালো !"

—"আস্ব, আস্ব, আস্ব !"

—"এবার এসে সে সেই কঙ্কাবতীর গপ্পটা বোলো—বুঝেচ ?"

"আচ্ছা" বলে তাড়াতাড়ি আমি পা চালিয়ে দিলুম ; খেঁদি কিন্তু

সহজে সঙ্গ ছাড়লে না,—ছলছল চোখে মুখখানি চুণ করে অনেকদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল।

আমি ফিরে বললুম, 'খেঁদি, এইবার তুমি বাড়ী যাও!"

—"যাই"—বলেই হঠাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলে, একদৌড়ে সে চলে গেল।

কি মমতা-ভরা প্রাণ! এমন মেয়ে আমি আর কখনো দেখি-নি! তার সেই শেষে-বিদায়ের হঠাৎ কান্না এখনো আমার বুকের মাঝখানে লেগে আছে।

৬

কল্‌কাতায় ফিরে এসেই আমার প্রথম কাজ হ'ল, খেঁদির ঠাকুমার হাতে দুশো টাকা পাঠিয়ে দেওয়া। সেইসঙ্গে একখানা চিঠিতে লিখ্‌লুম, "দেড়-শো টাকা খেঁদির বরের জন্যে, আর পঞ্চাশ টাকা তার বিয়েতে যেন খরচ করা হয়। খেঁদিকে বোলো, তাকে আমি ভুলি-নি।"

খেঁদির সঙ্গে যে শ্রীদামের খুব ভালোবাসা, তা আমি বেশ বুঝেছিলুম। বিবাহ হ'লে এদের দুজনের জীবনই হাসিমাখা হয়ে থাক্‌বে। তাই আমি তাদের মিলনের বাধা দূর করে দিলুম। আর কৃতজ্ঞতা বলেও ত একটা জিনিষ আছে! খেঁদির ঠাকুরমা লেখাপড়া জানেনা, ভদ্র-ঘরের মেয়েও নয়;—কিন্তু তার মধ্যে আমি যে দুর্লভ প্রাণের সন্ধান পেয়েছিলুম, দুশো টাকা ত তুচ্ছ কথা—লক্ষ টাকাতেও তেমন উচ্চ প্রাণ আর-কখনো দেখ্‌তে পাব না, সে হচ্ছে স্বর্গের পারিজাত।

চ

তারপর তিন বৎসর কেটে গেল। এর-মধ্যে সংসারের কোলাহলে ডুবে, খেঁদির কথা আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। কখনো-সখনো মাঝে মাঝে মনে হ'ত বটে, খেঁদির সঙ্গে আবার দেখা কর্‌ব বলে আমি অঙ্গীকার করে এসেছি—কিন্তু খেঁদি ত জানে না, সংসারীর কাছে অঙ্গীকারের মূল্য একটা কাণাকড়িও নয়।

এম্‌নি সময়ে ঈশানপুরের জমিদারের একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ এল। এত-বড় একটা বাঁধা মক্কেলের নিমন্ত্রণ অবহেলা করা ঠিক নয়। স্থির করলুম, এইসঙ্গে খেঁদিকেও একবার দেখা দিয়ে আস্‌ব। কেন জানি না, সেই দু-দণ্ডের আলাপেই খেঁদির উপরে আমার কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল! আমার নিজের ছেলে-মেয়ে কিছুই হয়নি, পরের মেয়েকে দেখে তাই কি আমার এতটা ভালোবাসতে সাধ হচ্ছে? হবে!

খেঁদির বিবাহে কিছু যৌতুক দিই-নি। তার জন্যে একছড়া হার, আর তার যে ফোটোখানা তুলেছিলুম, সেখানাও যাবার দিনে তাকে উপহার দেব বলে সঙ্গে নিয়ে গেলুম।

সেদিন আশ্বিনের ষষ্ঠী। বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে মায়ের প্রাণ সেদিন পরিপূর্ণ আনন্দে টল্‌টল্ করছে—চারিদিকের তৃণ-শস্য-তরুর বিপুল শ্যামলোৎসবের মধ্যে নৃত্যলীলা জাগিয়ে, শরৎ-সমীর সেদিন উমার আগমনী-গান গেয়ে বয়ে চলেছে কোথায়, কতদূর! গ্রামে গ্রামে সানাই ধরেছে সাহানা, পথে পথে রঙিন কাপড়ের স্রোত ছুটেছে পূজোবাড়ীর দিকে, বাঙালীর বুক থেকে খসে পড়েছে আজ দাসত্বের পাষাণ-ভার!

.....আজ সুধু হাসি, হাসি, হাসি—সবাই আজ হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে। এমন প্রাণভরা হাসির দিন বাঙলায় আর দ্বিতীয় নেই।

দূর থেকে দেখতে পেলুম, সেই বাঁশঝাড়ের তলায় বেড়-বাতাড়ের মাঝখানে পরিচিত চালাঘরখানি—তেম্‌নি হেলে-পড়া, তেম্‌নি নড়বোড়! ভাবলুম, না-জানি খেঁদি আজ কেমনধারা হয়েছে,—তার সেই সরল চপলতা আজ আর হয়ত নেই, আমায় দেখে আজ হয়ত সে মুখে টেনে দেবে একহাত ঘোমটা!

পায়ে পায়ে এগিয়ে দাওয়ায় গিয়ে উঠলুম। আস্তে আস্তে সাড়া দিয়ে ডাকলুম।

ভিতর থেকে খনখনে গলায় আওয়াজ এল—"কে ডাকে?"

এ খেঁদির ঠাকুর্দ্দা! বুড়ো এখনো বেঁচে আছে! তার যে মূর্ত্তি দেখে গিয়েছিলুম!

খেঁদির ঠাকুমা বেরিয়ে এল! বয়সের ভারে তার দেহ এখন সাম্‌নের দিকে আরো-বেশী ঝুঁকে পড়েছে, চোখ-দুটোও আরো-বেশী ঘোলাটে হয়ে এসেছে।

আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, বুড়ী আমাকে ঠিক চিনতে পারলে। খুসি হয়ে বললে, "ওমা, তুমি! এস বাবা, এস এস।"

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, এই তিন বছরেও তার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি—চারিদিকে ঠিক তেম্‌নি এলমেল ভাবে হরেক-রকমের ছোট-বড় জিনিষ গাদা করা আছে, খড়ের আঁটির পাশে ঠিক তেম্‌নি করে'ই খেঁদির ঠাকুরদাদার অস্থিচর্ম্ম-

সার মূর্ত্তি বসে বসে মরো-মরো হয়ে ক্রমাগত হাঁপাচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে !

আমি হারছড়া আর ফোটোগ্রাফখানা বার করে মেঝের উপরে রাখলুম। বুড়ো-বুড়ী দুজনেই অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইল।

আমি বললুম, "দেখ দেখি এই ছবিখানি !"

খেঁদির ঠাকুমা ফোটোখানা চোখের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে, দেখেই অবরুদ্ধ স্বরে আর্ত্তনাদ করে' উঠল ! কে যেন তার বুকে হঠাৎ একখানা ছুরি বসিয়ে দিলে !

বুড়ো তার বেরিয়ে-পড়া চোখদুটো আরো-বেশী বিস্ফারিত করে বললে "ওকি ওকি !"—

—"ওগো এ যে আমার খেঁদির ছবি গো !"—এই বলে বুড়ী ছবিখানাকে প্রাণপণে আপনার বুকের উপরে চেপে ধরলে !

বুড়ো তাড়াতাড়ি একখানা শীর্ণ আগ্রহ-ভরা হাত বাড়িয়ে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, "খেঁদির ছবি ? খেঁদির ছবি ?—কৈ, দেখি দেখি দেখি !"

কিছুই বুঝতে না-পেরে দ্বিধাভরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমরা এমন করচ কেন ? খেঁদি কোথায় ?"

বুড়ো খানিকক্ষণ আমার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর উপরদিকে একখানা কম্পমান হাত তুলে বললে, "স্বর্গে।"

—"অঁ্যা !"

—"বাবু গেল-বছরে খেঁদিকে হারিয়েচি। বেঁচে আছি আমরা—" বৃদ্ধ বুক চাপড়ে হাহাকার করে' উঠল।... ... ...

না না বিশ্বাস হচ্ছে না। এই জরাজীর্ণ রোগশীর্ণ মরণাপন্ন বৃদ্ধ, আর এই শোকক্ষীণা সহায়হীনা একান্ত-দীনা নারী, এদের চোখে চোখে আগ্‌লে-রাখা শেষ-সম্বলটুকু হরণ করতে পারেন—ভগবান কি এমন নিষ্ঠুর চোর!

... ...এ পৃথিবীতে ফোটা-ফুল বোঁটা ছিড়ে খসে পড়ে এক রাতে, কিন্তু ঝরা-ফুলের শুক্‌নো পাতা টিঁকে থাকে অনেকদিন!

বুড়ো-বুড়ী দু'জনেই পলক-হারা চোখে ছবির উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে—সেই অবকাশে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলুম। সে দৃশ্য কেউ সহ্য কর্‌তে পারে না।

বাইরে তেম্‌নি করেই আগমনীর সানাই সমান ভাবে বেজে চলেছে।

আজ সুধু হাসি হাসি হাসি—সবাই আজ হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে। কিন্তু এ হাসির সুর যাদের প্রাণে আজ বেসুরো বাজ্‌ছে, তাদের কথা ভেবে হৃদয় আমার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ল। খেঁদি! খেঁদি!

•

ধারা-শ্রাবণ

ক

মানিনা মানিনা—ভগবানকে আমি মানিনা !......তর্ক কর্‌তে চাও? শাস্ত্রের বচন তুল্‌তে চাও? আমার আপত্তি নেই। হয়ত ভগবান ব'লে কেউ আছেন। কিন্তু তাঁকে আমি মানিনা!

কেন মান্‌ব? মান্‌বার যদি কোন সঙ্গত কারণ থাকে, তবে আমার পক্ষে তাঁকে না-মান্‌বারও কি যথেষ্ট কারণ নেই? মানুষ কি অকারণে বিদ্রোহী হয়? যে একথা বলে মানুষকে সে চেনে না।

ভগবানের চেয়ে অনেক মানুষকে আমি বরং শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য! জীবের মঙ্গলের জন্যে এঁরা যত কেঁদেচেন, এঁরা যত ভেবেচেন, এঁরা যত স্বার্থত্যাগ করেচেন, ভগবানের মধ্যে তেমন করুণা কোনদিনই আমার চোখে পড়ে নি।......এঁদের নিজস্ব মহত্ব আর বিশ্বপ্রেমকে দেখিয়ে তোমরা ঈশ্বরকেই বড় ক'রে তুল্‌তে চাও। তাতেও আমার আপত্তি আছে—বিশেষ আপত্তি! কারণ ভগবান আর যা-হোন তা-হোন, করুণাময় কখনো নন।

ঠগীর চেয়ে তিনি বেশী নিষ্ঠুর। ঠগী তো দম বন্ধ ক'রে দু-এক মুহূর্ত্তে নরহত্যা করে, কিন্তু ভগবান আমাদের হত্যা করেন দিনে দিনে, র'য়ে-ব'সে, আজীবন ধ'রে। অবোধ বালকও ভাঙ্‌বার

জন্যে পুতুল গড়ে না। এখানে সেও ভগবানকে উঁচিয়ে গেছে। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লে ভগবানের পূজো করচ। কিন্তু এ পূজো এখনি থামিয়ে দাও। কারণ তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লেই তো তাঁর নির্ম্মমতা বেশী দারুণ হয়ে বুকে এসে বাজে। এ দুনিয়ায় মৃত্যুই সব-চেয়ে নিশ্চিত। তবু ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন কেন, তা ভেবে দেখেচ? আবার সকলকে ধ্বংস করবার জন্যে। তিনি পিতা? তাহ'লে প্রতিদিন লক্ষলক্ষ হত-পুত্রের বুকের রক্তে তাঁর হস্ত রাঙা হয়ে উঠ্‌চে—কিন্তু তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি আবার নূতন সৃষ্টি করচেন, আবার নূতন হত্যার আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। ভগবান মানুষের বিচারক? কিন্তু তাঁর বিচারক কে?

খ

ধনীর সন্তান আমি। যে-নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে বাস করলে মানুষ ঈশ্বর-ভক্ত হ'তে বাধ্য, ছেলেবেলায় আমার অদৃষ্টে তার কিছুরই অভাব হয়-নি।

সে-দিন আজ থাকলে আমিও ভগবানকে হয়ত না-মেনে পারতুম না!... ... কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারেই আমাদের সংসারের উপরে সর্ব্বশক্তিমানের নির্দ্দয় হস্তের ছায়া ধীরে ধীরে নেমে এল। সে ছায়া এখনো সরে-নি, বরং দিন-কে-দিন বেশী ঘনীভূত হয়ে নিরেট অন্ধকারে পরিণত হ'তে চলেছে।

এই ভেবেই আমি আশ্চর্য্য হই যে, কেবল কি আমাদের সংসারের উপরেই ঈশ্বরের তীক্ষ্নদৃষ্টি এমন স্থিরভাবে প্রসারিত হয়ে আছে? দুর্ভাগ্যের এমন বৈচিত্র থাকতে পারে তা আমি কখনো

ভেবে দেখি-নি। এ বৈচিত্র্যের অতলে এখনো থই পাচ্ছি না। আরো কত কি দেখ্‌ব তা কে জানে?

আমার দুর্ভাগ্যের গোটাকতক প্রধান ঘটনা তোমরা শোনো। হয়ত তোমরা শুনেও সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না,—তবু শোনো।

'স্পেকুলেসনে' বাবার সর্ব্বস্ব গেল। আমাদের হাল-চাল অনেকটা পথের ভিখারীর মত হয়ে পড়্‌ল—সে দৃশ্য বাবা বেশী-দিন প্রাণ ধ'রে দেখ্‌তে পার্‌লেন না—তাই এপারের মায়া একেবারে কাটিয়ে চ'লে গলেন পরপারে,—পরলোকে। তারপর গেলেন দাদা—যাঁর রোজগারে তখনো যেমন-তেমন ক'রে আমাদের সংসার চল্‌ছিল।

আগেই বলেছি—প্রথম জীবনে দুঃখের স্বোয়াদ আমি কোন-দিনই পাই-নি। যাকে বলে আদুরে ছেলে, সংসারের মধ্যে আমি ছিলুম ঠিক তাই।

সর্ব্বদাই বাবার সঙ্গে-সঙ্গে ফির্‌তুম। নিজের কাজে বাবা দু'বার বিলাতে গিয়েছিলেন। পাছে আমার জন্যে মনে-কেমন করে, সেই ভয়ে আমাকেও তিনি ফেলে যেতে পারেন-নি। আঁতুড়-ঘরেই আমি মা-মরা ছেলে—মানুষ হয়েছি বাবারই কোলে-পিঠে। বোধ করি, বাবা আমাকে সেইজন্যেই এতটা ভালোবাস্‌তেন।

বাবা ছিলেন ইংরেজী-মেজাজের লোক, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে থেকে আমারও প্রথম জীবনটা বিলাতী আবহাওয়ার ভিতরেই কেটে গিয়েছিল। ষোল বছর বয়সের মধ্যেই দু-দুবার বিলাতে গিয়ে এবং কল্‌কাতাতেও সাহেবী স্কুলে প'ড়ে আমার একটি শক্তি হয়েছিল

এই যে, আমি অনেক ইংরেজের চেয়েও ভালো ইংরেজী লিখ্‌তে পারতুম। বাল্যকাল থেকেই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী যশ অর্জ্জন করব।

দাদা যখন মারা গেলেন, তখন এই যশটুকুই আমার একমাত্র সম্বল। ভারতের ও বিলাতের অনেক ইংরেজী সাময়িক পত্রে আমি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখ্‌তুম। আমার চার-পাঁচখানা উপন্যাস বিলাতেও মন্দ আদর পায়-নি। সে-সব লেখায় আমি ভারতীয় জীবনের ছবিই দিতে চেষ্টা করেছি। হয়ত সে ছবির নূতনত্ব সমুদ্রের ওপারেও কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু এই ইংরেজী সাহিত্যই যে কখনো আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হ'তে পারে, এ-কথা কোনদিনই ভাবিনি। দাদার মৃত্যুর পর যখন দিন চলে না, তখন একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ পেয়ে ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিলুম; সে কথা আজও আমি ভুলি-নি। কিন্তু তখন জান্‌তুম না যে, ধন্যবাদে ভগবান ভোলেন না! মনুষ্য-মৃগয়ায় কোনদিন তিনি ক্ষান্ত দেন না।

বেশ মোটা মাইনে পেতুম। তারই উপরে নির্ভর ক'রে বিবাহও করলুম। কিছুকাল নূতন প্রেমের কল্পলোকে আনন্দের যে আভাস পেয়েছিলুম, এখানে কবির ভাষায় তা প্রকাশ ক'রে লাভ নেই। কারণ, আমি সুললিত প্রণয়-কাহিনী লিখ্‌তে বসি-নি, তা লেখ্‌বার মতন মনের হালও আমার নয়।

বিবাহের পর চারবছর কেটে গেল—ভাবলুম নিয়তির কোপ-দৃষ্টি থেকে এতদিনে বুঝি খালাস পেলুম।

ভুল—ভুল! কলেরা এসে আমার ভ্রম আবার ভেঙে দিলে। আমাকে ভুলোবার জন্যে ভগবান আনন্দের যে মায়ামৃগকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিলেন, ফাঁকি দিয়ে আবার তিনি তাকে কেড়ে নিলেন। বিপত্নীক আমি—প্রাণপণ আলিঙ্গনের মধ্যে শূন্যতাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে ধূলি-শয্যায় প'ড়ে হাহাকার করতে লাগ্‌লুম।... ... ...

কেঁদে কেঁদে কেঁদে কিনা জানিনা, কিন্তু এটা বুঝ্‌তে পারলুম—আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে। বড় বড় ডাক্তার দেখালুম—সবাই এককথাই বল্‌লেন, "তোমার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে—আর কোন উপায় নেই!"

উঃ, সে কি কষ্ট! জন্মান্ধ যে, তার দুঃখ আমার তুলনায় কত তুচ্ছ! পৃথিবীর পরতে পরতে এই রঙের খেলা, রূপের মেলা যে কখনো স্বচক্ষে দেখে নি, সে কেমন ক'রে বুঝ্‌বে যে এথেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কি?......আমার চোখের সাম্‌নে অন্ধকারের পর্দা ক্রমেই বেশী পুরু হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। দিনে দিনে দেখ্‌তে লাগলুম, প্রকৃতির মধুর রূপের ছবি, বিচিত্র রঙের ঢেউ, ছন্দিত গতির লীলা আমার সাম্‌নে থেকে জলের আঁকের মত মুছে মুছে মুছে মিলিয়ে যাচ্ছে! উষার সিঁদুর-লেখা, ভোরের শিশু রবি, গোধূলির মায়া-কিরণ, ভাঙা-মেঘে চাঁদের আলো, বাদলের ব্যাকুল মেঘ, শীতের সোনালী রোদ বসন্তের পুষ্পিত উপবন, শরতের অম্লান প্রভাত—বিদায়, বিদায়,—তোমাদের কাছে চির-বিদায়—হে বন্ধু, চির-বিদায়!

গ

অন্ধ! অন্ধতার এই অন্ধকূপে দশবৎসর মগ্ন হয়ে আছি।

প্রিয়তমার ছোট্ট স্মৃতি—আমার এই ছায়া। বিবাহের একবৎসর পরেই তাকে পেয়েছিলুম—এখন তার বয়স তেরো বৎসর। ভাগ্যে ছায়া ছিল, তথনো তাই ভগবানকে ভুলি-নি।

তেরো বছরের মেয়ে ছায়া—আমার এই ভগ্নচক্র জীবন-যানকে সেইই তার ছোট তুখানি দরদভরা স্নেহকোমল বাহু দিয়ে কোনরকমে কায়ক্লেশে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছে! বাছা আমার কোনদিন বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে পুতুল-খেলাও কর্‌তে পায়-নি, জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত সে পাকা গিন্নি। এই কাণা অথর্ব্ব বুড়ো ছেলেটির সেবায় তার কচি কচি হাত-তুটি সর্ব্বদাই জোড়া থাক্‌ত।

সম্পাদকী অনেকদিন ঘুচে গেছে। তবে আমার জন্যে দয়াপর-বশ হয়ে কাগজের সত্বাধিকারী গোটাকতক টাকার মাসিক ভাতার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার আগেকার লেখা ইংরেজী উপন্যাস ক'খানার কিছু কিছু বিক্রী এখনো আছে। কোনরকমে সংসার চ'লে যাচ্ছে।

বর্ত্তমানই আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। আর কিছু ভাব্‌তে পারি না—ভাব্‌তে ভয় হয়। অতীতের দিকে চাইলেই দেখি, নিজের হাতে সাজানো সারি সারি চিতা দাউ দাউ জ্বল্‌ছে,—কত বন্ধু, কত স্বজনের হারা-মুখ সেখানে শ্মশানের ধোঁয়ায় কলঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছে! ওঃ—চোখ নেই, কিন্তু এই অন্তর্দৃষ্টিও সেইসঙ্গে মুছে গেল না কেন?

ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌তে গেলে খালি একটি সত্যই মনে প'ড়ে যায়—ছায়ার আমার বয়স হচ্ছে! তারও বিয়ে দিতে হবে! কে এক পরের ছেলে এসে এই অন্ধের নড়িকে কেড়ে নিয়ে যাবে! কী

কুৎসিৎ এই সমাজের বিধি! এই অসহায়তা, এই জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে আমি প'ড়ে আছি—আমাকেও মেয়ের বিয়ে দিতে হবে কেন?

ঘ

ভগবান এখনো আমাকে ভোলেন-নি!

ভেবেছিলুম দুর্ভাগ্যের শেষ-ধাপে নেমে এসেছি, এর পরে আমার নিজের মরণ ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। ভগবান আবার আমার ভুল সুধ্‌রে দিলেন। নইলে বোধ হয় এই একটুখানি ফাঁকের জন্যে তাঁর এত-বড় বিশ্ব-সৃষ্টিটা দস্তুরমত ব্যর্থ হয়ে যেত!

আমার এই ধারাবাহিক দুঃখের কাহিনী নিশ্চয়ই কারুর ভালো লাগ্‌বে না। কেউ কেউ হয়ত ভাব্‌বেন, আমি অত্যুক্তি করছি। কিন্তু তা নয়—আমার একটি কথাও মিথ্যে বা বাড়িয়ে লেখা নয়! ভগবানের উপরে অতি-ভক্তিতে মানুষ অন্ধ হয়ে আছে। চোখ্‌ থাক্‌লে সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেত, পৃথিবীতে ভগবানের অবিচারের আর অত্যাচারের ইতিহাস কী বিরাট! লক্ষ লক্ষ মহাভারতেও তা কুলায় না। কাণ পেতে শোনো,—পৃথিবীর এই বাতাস আর তরুর অনন্ত মর্ম্মর, কোটি কোটি অত্যাচারিত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর আর্ত্তস্বর দিয়ে গঠিত কিনা! যাদের মরা উচিত তাদের উপরে নয়, যাদের বাঁচা উচিত তাদের উপরেই ভগবানের সদা-সচেতন মৃত্যু-দণ্ড অতর্কিতে আচম্বিতে নেমে এসে পড়ে!

যাক্—দুঃখের কথা আর বাড়াব না, এবার যা বল্বার খুব সংক্ষেপেই তা সেরে নেব।

হঠাৎ একদিন ছায়া অসুখে পড়্ল। জ্বর। প্রথমে ধরা পড়ে-নি, তারপর জানা গেল, টাইফয়েড।

ঘরপোড়া গরু যখন সিঁদূরে মেঘ দেখ্লেই ভয় পায়, তখন এত-বড় বিপদের কথা শুনে আমার মনের ভাব কি-রকম হোলো এখানে তা খুলে না বল্লেও চল্বে।

একে আমার এই নাচার অবস্থা, তায় অর্থাভাব। আমার কপালে বিপদ সর্ব্বদাই চরমে উঠেছে, তাই ছায়ার আশা আগে থাক্তেই আমি ছেড়ে দিলুম—আমার এই আঁধার ঘরের মাণিকটিকে হাতে পেয়েও মরণ যে তাকে পিছনে ফেলে রেখে বিদেয় হবে, এমন দুরাশা আমি কিছুতেই কর্তে পার্লুম না।

তবু একবার শেষ চেষ্টা তো কর্তে হবে! ছায়াকে বাঁচাতে হ'লে ভালো ডাক্তার ডাকা দরকার। ভালো ডাক্তার ডাক্তে হ'লে যথেষ্ট অর্থের দরকার। কিন্তু—কিন্তু অর্থ কোথায় পাব? শেষটা কি টাকার জন্যে চিকিৎসার অভাবে আমার এই শেষ-মায়ার পুতলীটিকে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্তে হবে? এ-কথা মনে হ'লে বাপের বুক কেমন করে, তা কি তোমরা বুঝ্তে পার্ছ?

আমার অন্ধ চক্ষু অশ্রুজলে ভিজে উঠ্ল। ব'সে ব'সে ভাবৃতে লাগলুম। টাকা, টাকা, টাকা! টাকা পাব কোথায়, কে আমায় টাকা দেবে—যে-টাকায় আমার ছায়াকে আবার মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে আন্ব?

একটা কথা স্মরণ হোলো। মাসখানেক আগে একজন

প্রকাশক (বোধ হয় তিনি আমার অবস্থার কথা জান্‌তেন না) আমার কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন যে, আমার কোন ইংরেজী উপন্যাস থাক্‌লে তিনি তা প্রকাশ কর্‌তে সম্মত আছেন।

অন্ধ হয়ে পর্য্যন্ত আমি আর উপন্যাস লিখ্‌তে পারি-নি। লেখ্‌বার শক্তিও ছিল না, লেখ্‌বার মত মনের অবস্থাও ছিল না। যদিও কাগজে-কলমে লেখ্‌বার ক্ষমতা আমার নেই, তবু বিলাতী লেখকদের মত 'টাইপ-রাইটারে' রচনা করা তো আমার পক্ষে এখনো অসম্ভব নয়! 'টাইপ-টাইটার' ব্যবহারে আমি বরাবরই নিপুণতার পরিচয় দিয়েছি। এখনো তারই সাহায্যে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে থাকি।

আজ বিপদে প'ড়ে আমার মাথায় এই বুদ্ধি এল। তখনি প্রকাশককে চিঠি লিখে জানালুম যে, দিন-দুয়েকের মধ্যে আমার লেখা একখানি ছোট উপন্যাস পেলে তিনি অন্তত দেড় হাজার টাকায় তার 'কপিরাইট' কিনে নিতে এবং হাতে হাতে টাকা চুকিয়ে দিতে রাজি আছেন কিনা?......উত্তরে জান্‌লুম, আমার সর্ত্তে প্রকাশকের কোনই অমত নেই।

তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হয়ো না যে, সেই সু-খবরে আমি ভগবানকে কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ দিলুম—একবার নয়, অনেকবার!

৬

বিকাল-বেলায় আমি আমার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলুম। চাকরের উপরে মানা রইল, আমি নিজে ঘর থেকে না বেরুলে কেউ যেন আমাকে বিরক্ত কর্‌তে না আসে।

বন্ধুর বাড়ী থেকে একটি ভালো 'টাইপ-রাইটার' চেয়ে আনিয়েছি। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের উপরই আজ আমার ছায়ার প্রাণরক্ষার ভার! একে না পেলে আমাকে হয়ত আত্মহত্যা করতে হোতো!

আমি খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা ও রচনা করতে পারি। হিসাব ক'রে দেখলুম, যদি একটানা ষোল-সতেরো ঘণ্টা পরিশ্রম করি, তবে কাল সকালে আটটা-নয়টার মধ্যে ছোটখাটো একখানি উপন্যাস লিখে ফেলতে পারব।

'টাইপ-রাইটারে'র সাম্নে গিয়ে বসলুম। লেখা সুরু করলুম নিজেরই দুঃখের কাহিনী ধ'রে। সেইসঙ্গে নানা কল্পিত ঘটনা মিশিয়ে আমার প্লটকে অবশ্য যথেষ্ট ঘোরালো, চিত্তাকর্ষক ও মর্ম্মস্পর্শী ক'রে তুলতেও চেষ্টার ত্রুটি করলুম না। কারণ আমি জানি, আমার নিজের যে-কাহিনী আজ তোমাদের সকলের কাছে ব'লে বুকের বোঝা হাল্কা করবার চেষ্টা পাচ্ছি, তার মধ্যে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নেই—তা অত্যন্ত বাস্তব এবং নিত্য-শ্রুত। সংসারে এমন মানুষ লাখো-লাখো রয়েছে, যাদের ললাটের উপর বিধাতা আমারই কাহিনীর পুনরুক্তি স্পষ্ট ক'রে লিখে রেখেছেন। সে কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখতে হ'লে আরো বেশী রং ফলিয়ে আমাকে খোদার উপরে খোদ্‌কারি করতে হবে। একঘেয়ে সাদাসিদে সত্যকথাও বারংবার সহ্য করা অসম্ভব।

লিখতে লাগলুম—প্রাণপণে। এমন ক'রে জীবনে আর-কখনো লিখি-নি,—লেখবার দরকারও হয়-নি। এ লেখার উপরে কেবল আমার সাহিত্যিক যশ নয়—আমার নিজের মরণ-

বাঁচন, আমার অন্ধ প্রাণের হাসি-কান্না—এককথায়, আমার ইহলোকের ভালো-মন্দ সমস্ত নির্ভর করছে। তাই লিখ্‌ছি, লিখ্‌ছি, আর লিখ্‌ছি—বিকেল গেল, সন্ধ্যে উৎরোলো, রাত হোলো, চারিদিক নিসাড় থম্‌থমে হয়ে এল, আমার কিন্তু সে-সব ভাব্‌বার এক মুহূর্ত্ত ছুটি নেই।

পাশের ঘর থেকে ছায়ার ও 'নার্সে'র' সাড়া পেলুম। ছায়া চেঁচিয়ে প্রলাপ বক্‌ছে, 'নার্স' তাকে ঠাণ্ডা কর্‌তে চেষ্টা পাচ্ছে। লিখ্‌তে লিখ্‌তে একবার থাম্‌লুম।......ছায়া আপন মনেই বল্‌ছে, "ওকি বাবা, ওদিকে যেও না—ওদিকে যেও না, ওদিকে ছাতের আল্‌সে, এখুনি প'ড়ে যাবে যে!......হ্যাঁ বাবা, তুমি যে বড় এখনো জেগে বসে আছ, অসুখ হবে যে,—শোও-গে যাও, এখনো গেলে না? না বাবা, তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে বাবা!......হ্যাঁ বাবা, সত্যি ক'রে বল দেখি বাবা, তুমি আমাকে বেশী ভালবাসো, না আমার মাকে?—আমাকে? ইস্—তোমার নিজের চেয়েও? ......ত্যাখো বাবা, তোমার জন্যে কেমন ফুলের মালা গেঁথেচি! সবে-ফোটা বেলফুল—গন্ধ পাচ্চো তো?......বাবা, তুমি চুপটি ক'রে ব'সে থাকো, আমাকে চুমু খাবার জন্যে অত দুষ্টুমি কোরো না—রও, আগে তোমার চুলটা ভালো ক'রে আঁচ্‌ড়ে দি, মাথাটা ভারি নোংরা হয়ে রয়েচে যে, লোকে দেখ্‌লে নিন্দে কর্‌বে—অত বড় ধাড়ী মেয়ে, বাপের যত্ন নেয় না"......

আমার ছায়া, আমার ছায়া! পিতৃময় জগতে সে একান্তে বাস করে—প্রলাপেও বাপের কথাই বল্‌ছে, অচেতনেও বাপের ভাব্‌নাই ভাব্‌ছে! এমন মেয়ে কার আছে?

সজল চোখে ফের লেখা সুরু করলুম। প্রত্যেক মুহূর্তের সঙ্গে হয়ত ছায়ার জীবন একটু-একটু ক'রে ক্ষয় হচ্ছে!.....বাতাসের শীতলতায় বুঝ্‌ছি, রাত ক্রমে ফুরিয়ে আস্‌ছে, বোধহয় এখন চাঁদ মুখ রাঙা ক'রে পশ্চিম আকাশের মৌন-রহস্যের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে! আমার লেখার কল কিন্তু সমান চল্‌ছে, চল্‌ছে আর চল্‌ছে! মাথা দপ্‌দপ্‌ কর্‌ছে, দেহ এলিয়ে পড়্‌ছে, দুহাত অসাড় হয়ে আস্‌ছে—তবু কিন্তু থাম্‌বার যো নেই। সারারাত্রের নিস্তব্ধতাকে ঠকাঠক্‌ শব্দে চঞ্চল ক'রে তুলে আমার অশ্রান্ত কল তাই চলেছে তো চলেছেই!

সকাল হোলো। তখনো লিখ্‌ছি। এক-একখানা পৃষ্ঠা 'টাইপ' হ'য়ে যাচ্ছে, আর আমি সেখানা পাশের চুব্‌ড়ীর ভিতরে ফেলে দিয়ে, কলের ভিতরে তাড়াতাড়ি আর একখানা সাদা কাগজ পূরে দিচ্ছি,—এম্‌নি ক'রে অনেক পাতা লেখা হ'য়ে গেছে। বেলা প্রায় ন'টার সময়ে গভীর একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমার লেখা শেষ কর্‌লুম্‌!··· সে যে কি বিপুল মুক্তির আনন্দ, তা আর বল্‌বার নয়! সেই আনন্দের স্বরূপ বর্ণনা কর্‌তে পার্‌লেও আর-একখানা চমৎকার উপন্যাস লেখা যায়! দেহের অবস্থা তখন শোচনীয়, কিন্তু সে সব কষ্ট-গ্লানি আমার আনন্দের উচ্ছ্বাসকে একটুও দমাতে পার্‌লে না। আমার আর কিছু ভাব্‌বার নেই—উপন্যাস শেষ করেছি, ছায়ার চিকিৎসার উপায় হয়েছে, তাইই যথেষ্ট! আমার আর একটি মস্ত তৃপ্তির কথা, আজ্‌কে যে উপন্যাস আমি একাসনে ব'সে সমাপ্ত কর্‌লুম, এর আকার ছোট হ'লেও এর চেয়ে ভালো বই নিশ্চয়ই আমি আর

কখনো লিখি-নি! এর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আমার প্রাণের কতখানি যে চোখের জলের সঙ্গে ঢেলে দিয়েছি, তা সুধু আমিই জানি—আমিই জানি! লেখক কি মন নিয়ে এ-লেখাটি লিখেছে তা কেউ জান্‌বে না বটে, কিন্তু বিলাতের পাঠক-সমাজে নিশ্চয়ই এর বিশেষ আদর হবে।

চ

ঘরের দরজায় কে ধাক্কা মার্‌লে।

আমি উঠে দর্‌জা খুলে দিতেই, বন্ধু নির্ম্মল এসে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "ওহে, ছায়াকে দেখ্‌তে এসেছিলুম। তার অসুখ যে আরও বেড়ে উঠেচে!"

আমি বল্‌লুম, "আজ্‌কেই কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের হাতে ছায়াকে সঁপে দেব। আমার যা সাধ্য তা কর্‌ব।"

নির্ম্মল আমার উপন্যাসের কথা জান্‌ত। সে বল্‌লে, "তবে কি তোমার লেখা শেষ হয়েচে?"

আমি বল্লুম, "হ্যাঁ। এখন লেখাটা তোমাকে একবার চেঁচিয়ে পড়্‌তে হবে—কিছু-কিছু সুধ্‌রে আজ্‌কেই প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌ব। লেখা কাগজগুলো চুব্‌ড়ীর ভেতরে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। তুমি ভাই ওগুলো তুলে সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেল তো!"

নির্ম্মল খানিক পরে বল্‌লে, "ওহে, তোমার লেখা কাগজ কোথায়?"

—"কেন, ঐ বেতের চুবড়ীর ভেতরে!"

নির্ম্মল আরো কিছুক্ষণ খুঁজে বল্‌লে, “চুবড়ীর ভেতরে অনেক-গুলো কাগজ রয়েছে বটে, কিন্তু সব যে দুপিঠ সাদা !”

একটু আশ্চর্য্য হ’য়ে বল্‌লুম, “কি বল্‌চ হে, ভালো ক’রে ছাখো, ভালো ক’রে ছাখো !”

নির্ম্মল বল্‌লে, “চুবড়ী আর দেখ্‌তে হবে না, কি হয়েচে আমি বুঝেচি !” ব’লেই সে কলটা একবার চালালে। তারপর বল্‌লে, “চমৎকার অস্ত্র তোমার ! কলের ভেতরে কালির ফিতে নেই !”

কালির ফিতে নেই ! দু-পিঠ সাদা কাগজ ! তবে কি [illegible] সকাল ধ’রে একাসনে ব’সে আমি এই পণ্ডশ্রম—

পাশের ঘর থেকে ছায়া আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—আমি মাথা ঘুরে মাটির উপরে আছ্‌ড়ে পড়্‌লুম !.........

—তারপর ? আমার জীবন-কাহিনী আর বল্‌তে চাই না, কি হবে তা শুনে ? তা বিস্বাদ, তিক্ত, দুঃসহ ! এইটুকু কেবল শুনে রাখো,—তারপর থেকে আমি ভগবানকে মানি না ! জীবনে আর কোনদিন মান্‌বও না।

বেচারীর বেচাল্

(শেখভের অনুসরণে)

পাড়ার মেয়ে-মহলের তাসের আসর হইতে মোহিনী যখন ফিরিয়া আসিল, সেনেদের বাড়ীতে তখন একটা খণ্ড-কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড অভিনয় হইতেছিল।

বাড়ীতে ঢুকিতে-না-ঢুকিতে মোহিনীর কাণে প্রথমেই ঢুকিল, উপর হইতে সেন-গিন্নীর চড়া গলার কড়া হুম্‌কি! তারপর দেখিল, উঠানের একপাশে পা-দুটো সটান ছড়াইয়া বসিয়া বুড়ী থাক-ঝি, মুখের কথায় ছিঁচ-কান্নার নাকী সুর লাগাইয়া বলিতেছে, "অ-গ, আমার কপালে কি এই ছিল গ—!"......তারপর দোতালায় উঠিয়াই দেখিল, বাড়ীর কর্ত্তা ব্যজার-মুখে তাহার সুমুখ দিয়া তাহাকে না-দেখিয়াই আপনমনে বকিতে-বকিতে চলিয়া গেলেন, "দূর হোক্-গে, দূর হোক্-গে ছাই! গিন্নীর বুদ্ধি-সুদ্ধি কি সব লোপ পেয়েচে! ও কর্‌চে কি এ? ছি ছি!"

মোহিনী ভাবিল, 'গিন্নীর সঙ্গে কর্ত্তার আজ খুব-এক-হাত হয়ে গেছে দেখ্‌চি!'

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকিয়াই সে একেবারে থ! তাহার সাম্‌নেই বিরাটবপু লইয়া সেন-গিন্নী, অচল মৈনাকের একটি ছোটখাটো সচল সংস্করণের মত ছুটোছুটি করিতেছেন,—আর ঘরের চারিদিকে সমস্ত জিনিষ-পত্তর লণ্ডভণ্ড, ওলট্-পালট্ হইয়া ছড়ানো!

মোহিনীকে দেখিয়াই গিন্নী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া, হাঁসফাঁস্ করিতে-করিতে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

মোহিনী অবাক হইয়া দেখিল, তার প্যাট্‌রাটাও খোলা পড়িয়া রহিয়াছে! ব্যাপার কি?

এমনসময় খুকীর ঝী আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে খুকির ঝী, কি হয়েচে রে?"

খুকির ঝী দুইগালে দুইহাত রাখিয়া, মাথা নাড়িতে নাড়িতে চোখ পাকাইয়া বলিল, "মা, মা, মা! এমন কাজের মুখে সাত ঝাড়ু, সাত ঝাড়ু! অ্যাঁঃ! বলে কিনা আমরা চোর? হ্যাঁ বামুনমেয়ে, তুমিই বল বাছা, একি সহ্য করা যায় গা?"

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "চোর? কে চোর?"

—"আমরা গো আমরা! গিন্নীর বালা নাকি পাওয়া যাচ্চেনা, সব্বাইকে তাই চোর বলা হচ্চে! আমাদেরও যাই মর্‌তে ঠাঁই নেই, তাই—"

—"বালা চুরি গেছে ত আমার ঘর হাঁট্‌কানো হচ্ছিল কেন?"

—"সকলকার ঘরেই খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে! আমার ঘরও বাদ পড়ে-নি—আমার আঁচলের খুঁটটি পর্য্যন্ত খুলে দেখা হয়েচে! সাত ঝাড়ু, সাত ঝাড়ু,—অমন কাজের মুখে সাত ঝাড়ু! আমাদেরও যাই ঠাঁই নেই মর্‌তে, তাই—"

মোহিনী আবার বাধা দিয়া আশ্চর্য্য স্বরে বলিল, "কিন্তু আমার ঘর হাঁট্‌কানো হচ্ছিল কেন?"

—"বল্‌চি ত বাছা, গিন্নীর বালা চুরি গেছে! তাই তোমার ঘরে বালা লুকনো আছে কিনা দেখা হচ্ছিল। তা তোমার অত ভয়টা কিসের? তুমি ত আর চুরি কর্‌তে যাও-নি?"

লজ্জায় ঘৃণায় মুখ রাঙা করিয়া নিশ্বাস চাপিয়া মোহিনী বলিল, "ছিঃ ছিঃ! আমার জিনিষে হাত দেবার উনি কে? আমি চোর!"

খুকির ঝী দীর্ঘশ্বাস টানিয়া বলিল, "আর বাছা, পরের প্রাণে কি দরদ থাকে? তুমি ভদ্দরলোকের মেয়ে হ'লে কি হবে মা! তুমি যখন পরের চাক্‌রি কর্‌চ তখন এ সব লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য কর্‌তে হবে বৈকি!"

খুকির ঝী চলিয়া গেল। মোহিনী হাঁপাইতে-হাঁপাইতে মাদুরের উপরে ধুপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার জীবনে এমন অপমান এই প্রথম। ভদ্রঘরের মেয়ে সে, গরিব বলিয়াই তাকে পরের বাড়ীতে চাক্‌রি স্বীকার করিতে হইয়াছে, আর তার উপরেই কিনা এই কুৎসিত সন্দেহ! হয়ত এখনি পুলিস ডাকিয়া আনা হইবে, পুলিস হয়ত তাহাকেই সন্দেহ করিয়া থানায় টানিয়া লইয়া যাইবে!... ... ... হায়, গরিব হওয়ার কত জ্বালা! দেশে তার বুড়ো অথর্ব্ব বাপ আছেন, তাঁর জন্যই তার এই কষ্টস্বীকার। সে এখন যদি চাক্‌রি ছাড়িয়া দেয়, তাহাহইলে বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া কাহার আশ্রয়ে গিয়া দাঁড়াইবে? অল্পবয়সেই সে বিধবা, শ্বশুরবাড়ীতেও এমন কেউ নাই, যে তাদের দুঃখে মুখ তুলিয়া চাহিবে।

বসিয়া-বসিয়া অকূল-পাথার ভাবিতেছে, এমনসময় বাহির হইতে ডাক্‌ আসিল, "ওগো বামুন-মেয়ে, উনুনে আগুন দেওয়া হয়েচে, উনুন যে জ্বলে যাচ্চে!"——

তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া মোহিনী রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিল।

রান্নাঘরের জান্‌লা দিয়া সে দেখিতে পাইল, দালানের উপরে একখানি পশমের আসনে বসিয়া কর্ত্তা জলখাবার খাইতেছেন, আর খানিক তফাতে বসিয়া গিন্নী, থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিপাতউন্মুখ আগ্নেয়গিরির মত গুম্‌রাইয়া উঠিতেছেন।

কর্ত্তা খুব আস্তে আস্তে বলিলেন, "হ্যাঁগা, একজোড়া বালা হারিয়েচে বলে তুমি এত-বেশী হাঁক্‌পাক্ করুছ কেন ?"

গিন্নী খন্‌খনে গলা তুলিয়া বলিলেন, "মরে যাই! কথার ছিরি দেখোনা! ঘরের ভেতর থেকে বালা গেল চুরি, আর আমি কিনা চুপ করে' নিশ্চিন্তি হয়ে বসে থাক্‌ব! কোন্ বিধাতা তোমায় গড়েছিল গা ? তার বুদ্ধিকে বলিহারি।"

কর্ত্তা খানিকক্ষণ আর-কিছু উচ্চবাচ্য করিতে ভরসা পাইলেন না। তারপর বেলের পানার শ্বেত-পাথরের বাটিটি মুখের উপরে তুলিয়া, তাহার আড়ালে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি মোহিনীর ঘরে গিয়ে জিনিষ ঘাঁট্‌ছিলে কেন ? সে বেচারী ভদ্দর-লোকের মেয়ে, কি মনে করুলে বল দেখি ?"

গিন্নী খ্যাঁক্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক্! ভদ্দর-অভদ্দর কারুকে আমি বিশ্বাস করি না। বরং, বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, ছোটলোকের এত বড় বুকের পাটা হয় না! ঐ বামনী-ছুঁড়ি আবার লেখাপড়া জানে, ও সব করুতে পারে!"

—"চুপ চুপ, শুন্‌তে পাবে যে!"

—"শুনুক-গে! ঝী-বামুনকেও আবার ভয় করে' চলতে হবে নাকি ?"

—"ছিঃ, এ-সব তোমার অন্যায় হচ্ছে!"

—"থামো, থামো! আথ চিবুচ্ছ, আথ চিবোও! চিবিয়ে-চিবিয়ে ফের যদি কথা কইবে ত টেঁর পাইয়ে দেব মজাটা!"

এক ধমকেই কর্ত্তার মুখে রা হরিয়া গেল। দুর্দ্দান্ত গুরু মহাশয়ের উদ্যত বেতের সাম্‌নে দুষ্ট ছেলের মুখ যেমন হয়, ঠিক তেম্‌নিধারা মুখ করিয়া কর্ত্তা হেঁট মাথায় মাটির দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখ মেলিয়া রহিলেন।

... ...

সে রাত্রে মোহিনী আর চোখ্ মুদিতে পারিল না। গিন্নীর নিষ্ঠুর কথাগুলো কাঁটার মত পট্‌পট্ করিয়া তাহার বুকের মাঝখানে বিঁধিতে লাগিল। সে বেশ বুঝিল, গিন্নীর সন্দেহ সব-চেয়ে বেশী তাহার উপরেই। রাগে অপমানে ঘৃণায় ভয়ে মোহিনীর প্রাণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে মনে মনে পণ করিল, না খাইয়া মরিবে তাও ভালো, তবু এ বাড়ীতে আর এক রাতও থাকিবে না।......

ভোরবেলা উঠিয়াই সব-আগে মোহিনী তার প্যাঁটরা গুছাইয়া পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিতে সুরু করিল। এ ঘরে আর এক দণ্ড তিষ্ঠিতেও তার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।

এমনসময় ঘরের সুমুখ দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া কর্ত্তা হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কি হচ্চে মোহিনী ?"

মোহিনী নতমুখে, মৃদুস্বরে বলিল, "গিন্নী-মা কাল আমায় যে অপমানটা করেছেন, তারপরেও এ-বাড়ীতে আমার আর থাকা পোষায় না। তাই আমি জিনিষ-পত্তর্ গোছাচ্ছি।"

কর্ত্তা একবার ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিলেন। কেউ

কোথাও নাই দেখিয়া, আস্তে-আস্তে তিনি ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপরে কাতর স্বরে বলিলেন, "আমি সব বুঝেছি মোহিনী। ওদের যা-খুসী করুক, তাবলে তুমি কেন চলে যাবে?"

মোহিনী মুখে কিছু বলিল না—আপন মনে যেমন জিনিষ গুছাইতেছিল, তেম্‌নি গুছাইতে লাগিল।

কর্ত্তাও খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিলেন, কি যে বলিবেন সেটা যেন তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।... ...তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "গিন্নীকে জান ত, তার মাথা একটুতেই অম্‌নি গরম হয়ে ওঠে। সে পাগ্‌লীর কথায় কি আর রাগ কর্‌তে আছে?"

মোহিনী কোন উত্তর দিল না।

—"মোহিনী, গিন্নীর যে দোষ হয়েচে, এ আমি মেনে নিচ্ছি। লক্ষ্মীটি, তুমি কিছু মনে কোরো না!"

মোহিনী এবারেও জবাব দিল না—পোঁটলাটা আরো ভালো করিয়া বাঁধিতে লাগিল। সে বুঝিল, কর্ত্তার কাকুতি-মিনতির মূল্য কিছুই নাই—এই ভীতু ভালোমানুষ লোকটিকে এ-বাড়ীতে কেহই ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না—এমন-কি ঝী-চাকররা পর্য্যন্ত! তাঁহাকে প্রতিপদে সকলেরই মুখ চাহিয়া চলিতে হয়,—এ সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেছেন গৃহিণী! সুতরাং কর্ত্তার কথায় কেমন-করিয়া সে এ-বাড়ীতে থাকিবে?

মোহিনীকে তখনো নীরব দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "হুঁ!... ...এত করে' বল্‌ছি, তবু তুমি কথা কইলে না! আচ্ছা, কি-কর্‌লে তুমি তুষ্ট হও? আমাকে মাপ্‌ চাইতে বল? বেশ, যা হয়েচে,

তার জন্যে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা! বুঝ্‌লে? আমি ক্ষমা চাইছি!"

কর্ত্তা ঘরের এদিকে-ওদিকে একটু বেড়াইয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শুন্‌ছ মোহিনী? আমি ক্ষমা চাইছি!"

মোহিনী প্রাণের আবেগ চাপিয়া, কর্ত্তার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনার কোন দোষ নেই, আমি জানি। আমার জন্যে কেন আপনি কষ্ট পাচ্ছেন?"

—"না মোহিনী, তোমার জন্যে আমি কষ্ট পাচ্ছি না! ... কিন্তু, কিন্তু, তুমি এখান থেকে চলে যেও না! বল, থাক্‌বে?"

মোহিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কর্ত্তা শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চাহিয়া, কোঁচার খুঁটটা লইয়া আঙুলে জড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দেখিলে বোঝা যায়, তিনি যেন একমনে কি ভাবিতেছেন।

মোহিনীর পোঁটলা গুছানো শেষ হইল।

কর্ত্তা ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিলেন, "মোহিনী, তুমি জাননা, তোমার ব্যবহারে আমার কি কষ্ট হচ্ছে! তুমি কি আমাকে জোড়-হাত কর্‌তে বল?—কিসে তোমার মন ফির্‌বে? যে কথা আমি কারুকে বলি-নি, কারুকে বল্‌বও না ভেবেছিলুম, তুমি কি তবে সেই কথাটাই শুন্‌তে চাও? বেশ, শোনো!

মোহিনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—"গিন্নীর বালা নিয়েছি আমিই। কেমন, এইবার তুমি তুষ্ট হ'লে ত? কিন্তু সাবধান, এ-কথা যেন আর কেউ শুন্‌তে না পায়!"

মোহিনী যেন নিজের কাণকেই বিশ্বাস করিতে পারিল না! এ কী কথা! এও কি সম্ভব?

—"আমার এক বন্ধুর অত্যন্ত টাকার দরকার হয়েছিল। ঐ বালা বাঁধা রেখে তাকে আমি টাকা দিয়েছি। কি করব, এ ছাড়া আমার আর উপায়ও ছিল না। গিন্নীর কাছে হাত পাত্‌লে আমি সিকি পয়সাও পেতুম না!"

মোহিনী থামিয়া থামিয়া বলিল, "কিন্তু—তাবলে চুরি—"

—"না, আমি চুরি করি-নি। ও বালা দিয়েচে কে? আমিই দিয়েচি! কিন্তু গিন্নী ত ভুলেও তা ভাবেন না—তিনি আমার সর্ব্বস্ব দখল করে' বসে আছেন, একটা পয়সার দরকার হ'লেও আমাকে তাঁর কাছে হাত পাত্‌তে হয়। কিন্তু কি করব বল—এজন্যে ত আমি নিজের স্ত্রীর নামে আদালতে নালিস কর্‌তে পারি না!... যাক্ সে কথা। এখন তুমি ত আর আমাকে ছেড়ে যাবে না?"

—"না, এখানে আমার আর থাকৃতে ইচ্ছে নেই!"

কর্ত্তা হতাশ, দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "বেশ, তবে যাও। এখান থেকে গেলে তুমি সুখী হবে বটে, কিন্তু এই নির্বান্ধব পুরীতে আমার দিকে মুখ তুলে চায়, এমন আর কেউ থাকৃবে না! যতদিন তুমি এসেচ, তোমার কাছ থেকে আমি মায়ের আদর, মেয়ের যত্ন পেয়েচি। তুমি চলে গেলে আমার বাঁচা-মরা দুই সমান হবে!"

বাহির হইতে গিন্নীর গলা শোনা গেল—"খুকির ঝী, অ খুকির ঝী! কর্ত্তাকে ডেকে দে ত রে!"

বেচারী কর্তা! গিন্নীর গলা শুনিয়াই তাঁহার পেটের পিলে যেন চমকাইয়া গেল—তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময়ে করুণ মিনতি-ভরা চোখে মোহিনীর দিকে চাহিয়া, চুপিচুপি সুধু বলিয়া গেলেন, "যাস্ নে মা, যাস্‌নে!"

… … … আঁচলে চোখের জল মুছিয়া মোহিনী, পোঁট্‌লা-পুঁটুলি সব আবার খুলিয়া ফেলিল। বাহিরে গিয়া থাকঝীকে ডাকিয়া বলিল, "অ থাকী! বেলা হোলো যে, আজ কি আর উনুনে আগুন দিতে হবে না লা?"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা

আলেয়ার আলো (সামাজিক উপন্যাস)		১।৵০
জলের আল্পনা	ঐ	১॥০
কাল-বৈশাখী	ঐ	১॥০
পায়ের ধূলো	ঐ	২৲
রসকলি (হাস্যোপন্যাস)		২৲
সুচরিতা (রুশ-উপন্যাসের অনুবাদ)		১॥০
ভোরের পূরবী (ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ)		১।০
পসরা (ছোটগল্পের বই)		১৲
মধুপর্ক	ঐ	॥০
সিঁদুরচুপড়ী	ঐ	॥০
মালা-চন্দন	ঐ	১।০
ফুলছড়ী (ঐ—যন্ত্রস্থ)		
প্রেমের প্রেমারা (হাস্য-নাট্য, মিনার্ভায় অভিনীত)		।৵০
ছুটির ঘণ্টা (সচিত্র শিশুপাঠ্য গল্প ও ছড়া)		১৲
আর্ট (প্রবন্ধ—যন্ত্রস্থ)		
গ্রীসের গল্প (বালক-পাঠ্য—যন্ত্রস্থ)		

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সওগাত (২য় সংস্করণ) মূল্য ১।০

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন, "চারুবাবুর পাকা হাতের এই গল্পগুলি যে ভাল লাগিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বই খানির ছাপা পরিপাটী। এই বহির প্রচার হইলে আমরা সুখী হইব।"

পুষ্পপাত্র (২য় সংস্করণ) মূল্য ১।০

বিজলী বলেন, "বই খানাকে শুধু সুন্দর বল্‌লে খাটো করা হয়। প্লটের মৌলিকতায়, রচনার চাতুর্য্যে, বর্ণনার মাধুর্য্যে, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইএর সৌন্দর্য্যে "পুষ্পপাত্র" সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

আঁধি মূল্য ২॥০

বাঙ্গালীর সংসারের একটী অশ্রুসজল কাহিনী। যে গাছ শুকাইয়াছে তরুণ-লতা তাহাতে আর কি তেমন আশ্রয় পাইয়া বাঁচিতে পারে! মানব চিত্তেও এই সত্য প্রত্যক্ষ করা যায়। নর-নারী ও বালিক-বালিকা চিত্তের সুনিপুণ বিশ্লেষণ, পরম উপভোগ্য! পড়িয়া চোখের জল ফেলিতেই হইবে।

আমাদের মাসিক পত্রিকা—

প্রভাতী

বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ আনা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার, বিনয়কুমার সরকার, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রভৃতি প্রভাতীর নিয়মিত লেখকলেখিকা।

গ্রাহকগ্রাহিকাদের রচনা সংশোধন করিয়া ছাপা হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত

তন্বী মূল্য ১।০

সাহিত্যাচার্য্য ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, "আমার বড়ই ভাল লাগে।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতা

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশের

ভাঙ্গাগড়া মূল্য ।৵০

বর্ত্তমান আন্দোলনের উপযোগী পুস্তক। মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের সম্যক্ স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত। ভাবিবার, বুঝিবার ও শিখিবার অনেক কথা ইহাতে পাইবেন।

